রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবন

মতিউর রহমান নিজামী

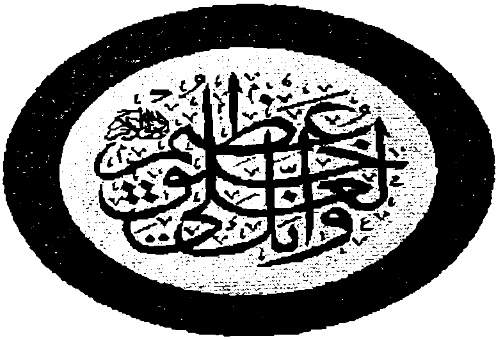

(হে নবী মুহাম্মদ!) নিশ্চয় তুমি নীতি নৈতিকতা ও
উত্তম চরিত্রের সর্ব্বোচ শিখরে প্রতিষ্ঠিত - *সূরা আল কালাম : ৪*

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবন

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবন

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক

অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম

চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল

জুন- ২০০৭

আষাঢ় -১৪১৪

জমাদিউল আউয়াল - ১৪২৮

প্রচ্ছদ - হামিদুল ইসলাম

কম্পোজ

সফটেক কম্পিউটার

বড় মগবাজার

মূল্য : ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র

মুদ্রণে

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

■	**ভূমিকা**	০৯
১.	**মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যত ও নবুয়্যতের মক্কী জীবন**	১১
	রাসূল (সা)-এর আগমনের উদ্দেশ্য	১১
	রাসূলুল্লাহর নবুয়্যতী জীবন বিভিন্ন স্তর	১৫
	মক্কী জীবনের চার স্তর	১৫
	মক্কী জীবনের কার্যধারার বৈশিষ্ট্য	২৫
২.	**আল কোরআন নাযিল ও বিরোধিতা**	২৮
	আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা	২৮
	নবুয়্যত পূর্ব জীবন ঃ একটি সমীক্ষা	২৯
	অহি (কুরআন) নাযিল	৩২
	অহীর দাওয়াত ও বিরোধিতা	৩৮
	তীব্র বিরোধিতা	৪২
	হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত	৪২
	রাসূলের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র	৪৯
৩.	**সন্ত্রাস ও বিরোধিতা মোকাবেলার কৌশল**	৫৯
	ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	৭৮
	শি'আবে আবু তালিবে বন্দী জীবন অবসানের ঘটনা	৮৪
	আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর ঘটনা	৯৩
৪.	**সাহাবীদের উপর অকথ্য নির্যাতন**	৯৭
	হযরত খালিদ বিন সাঈদের (রা.) উপর নির্যাতন	১০০
	হযরত আবু বকরের (রা.) উপর অমানুষিক নির্যাতন	১০১
	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রহৃত হলেন নির্মমভাবে	১০৩

www.bjilibrary.com

হযরত বেলালের (রা.) উপর নির্যাতন ১০৪
হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা.) উপর অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী ১০৫
হযরত খাব্বাব বিন আল আরাতের (রা.) উপর জুলুম ১০৭

৫. তায়েফে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা ১১০

৬. মে'রাজ : উদ্দেশ্য ও শিক্ষা ১১৯

৭. মক্কী জীবনের শেষ ৩ বছর : টার্নিংপয়েন্ট ১৩০
বিভিন্ন গোত্রের নিকট দাওয়াত প্রদান ১৩১
আকাবার বায়াত এবং মদিনায় ইসলামের আলো ১৩২

৮. আকাবার শেষ বায়াত : মদিনায় রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শপথ ১৩৯
আকাবার তিনটি বায়াত থেকে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা ১৪৯
মদিনায় ময়দান তৈরির কাজ ১৫১
হিজরত পূর্ব কুরআনী নির্দেশনা ১৫৪

৯. মদিনায় হিজরত ১৬৫
ইতিহাসের এক কঠিনতম রজনী ১৭৬
হিজরাতে রাসূল (সা.) ও আবু বকর (রা.) পরিবারের ভূমিকা ১৭৯
সওর গুহায় একটি দুশ্চিন্তার মুর্হূতে ১৮০
সওর গুহায় আশ্রয় ও অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্ব ১৮১
সওর পর্বত গুহা থেকে মদিনার পথে যাত্রা হল শুরু ১৮২
চলার পথে আল্লাহর কুদরতী সাহায্য ১৮৩
মদিনাবাসীর প্রতীক্ষার মুর্হূত ১৮৫
প্রতীক্ষার অবসান হলো ১৮৬
কুবায় হুজুরের অবস্থান ১৮৬
কুবা থেকে এবার মদিনার পথে ১৮৭
মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা ১৯০
ঈমান ও আদর্শ ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ১৯০
মদিনা সনদ ১৯১

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা। মানুষের ইহজীবনে শান্তি ও কল্যাণের ব্যবস্থা ইসলাম এবং পরজীবনে মুক্তি ও সাফল্য অর্জনের রাজপথ ইসলাম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এই জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন অহী তথা আল কুরআনের মাধ্যমে। আর এই জীবন-ব্যবস্থার শিক্ষক ও মডেল হিসেবে প্রেরণ করেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম প্রচার করেছেন, কুরআন শিক্ষাদান করেছেন, ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং নিজে এর অনুসরণ ও প্রয়োগ করে নমুনা স্থাপন করে গেছেন।

তাই, ইসলামকে এবং ইসলামের মূল উৎস আল কুরআনকে যথার্থভাবে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে হলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত তথা জীবনাদর্শের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি ছাড়া তা সম্ভব নয়।

ব্যক্তি জীবনে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্যে যেমন তাঁর সীরাত অধ্যয়ন ও অনুসরণ অপরিহার্য, ঠিক তেমনি ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী সমাজ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও তাঁর সীরাতের উপলব্ধি ও অনুসরণ অপরিহার্য। এর কোনো বিকল্প নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সীরাতের উপর এযাবত বেশ কিছু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত ও অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। তারপরও আমরা এ গ্রন্থটি লিখেছি বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দীন প্রচার ও

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্মুখে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

এ গ্রন্থে আমরা রাসূল্লাহ (সা.) এর দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি, দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া এবং বিরোধিতার মুখে দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখার কৌশল আলোচনা করেছি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী লোক তিনি কিভাবে তৈরি করেছেন এবং কিভাবে ইসলামের পক্ষে মানুষের মন জয় করেছেন সে বিষয়গুলোও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামের পথে দাওয়াতদানকারী এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করাই এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। আশা করি এটি তাদের গাইডবুক হিসেবে কাজে আসবে।

গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী (রহ)-এর তাফহীমুল কুরআন ও সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থদ্বয় এবং আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.)-এর সীরাতুন্নবী (সা.) গ্রন্থটি আমি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছি। আল্লাহ পাকের কাছে তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করছি।

মতিউর রহমান নিজামী
৩ জুলাই ২০০৭

www.bjilibrary.com

(১)

মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যত ও নবুয়্যতের মক্কী জীবন

রাসূল (সা)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। তিনি গোটা মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন হিসেবে। বাস্তবেও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) গোটা মানবজাতির জন্যে শান্তি কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন যা চির ভাস্বর ও অমলিন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সর্বশেষ নবীকে আখ্যায়িত করেছেন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন হিসেবে, কথা এখানে শেষ নয়। তিনি ঘোষণা করেছেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"হে নবী মুহাম্মদ! তুমি নীতি-নৈতিকতার ও উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত।"

সেই সাথে ঈমানদার মানুষের জন্যে ঘোষণা করেছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।"

(সূরা আল আহযাব-২১)

www.bjilibrary.com

আর রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ফলে মুসলিম উম্মাহকে গোটা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত হওয়ার শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব ভাষায়-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّـــاسِ وَيَكُـــونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا -

"এভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে করে তোমরা গোটা মানবজাতির সামনে সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষী হতে পারো আর তোমাদের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে থাকবেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)।" (সূরা আল বাকারা-১৪৩)

এই নির্দেশনার সারকথা–মুহাম্মদ (সা.) কে সার্থকভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করলে, জীবন জিন্দেগীর সবখানে কেবল মাত্র তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে মুসলিম উম্মাহ্ অবশ্যই গোটা মানবজাতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

দুনিয়ার মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই ছিল সব নবী-রাসূলের (সা.) মূল দায়িত্ব। সকল আসমানী কিতাবেরও মূল আবেদন ইনসাফ এবং ইনসাফ। নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব নাজিলের লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِـــيزَانَ لِيَقُـــومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -

"আমি যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছি প্রামাণ্য দলিলসহ, আর নাজিল করেছি কিতাব এবং ন্যায়ের দণ্ড যাতে করে গোটা মানবজাতি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" (সূরা আল হাদিদ-২৫)

সর্বশেষ নবীর উপর নাজিলকৃত কিতাব আল কোরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুই হল মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যার অনিবার্য দাবি হল– সব মানুষ এক

www.bjilibrary.com

আল্লাহর প্রভুত্বের অধীনে সকলে হবে একে অপরের ভাই– কেউ কারো প্রভু নয়– নয় কারো গোলাম। আল্লাহ্ তায়ালার চমৎকার আহ্বান-

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ-

"বল এসো আমরা একটি এমন কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই যা আমাদের সকলের জন্যে সমান কল্যাণকর, সকলের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষণে সক্ষম সেটা হল আমরা অঙ্গীকার করি এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত বন্দেগী করব না– হুকুম মানব না। আর ঐ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীকও করব না। আমরা আমাদের মধ্য থেকেও কাউকে প্রভু রূপে গ্রহণ করব না।" (সূরা আলে ইমরান-৬৪)

আল্লাহর রাসূলের খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আল্লাহর এই ঘোষণার সার্থক ব্যাখ্যা- "আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও আর হয়ে যাও তোমরা একে অপরের ভাই।"

আমরা বলছিলাম ইনসাফ, আদল বা কিস্‌ত্ হল আল কোরআনের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু। যার প্রকৃত দাবি নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও আসমানী কিতাব সমূহের বাণী শুধু সীমিত অর্থে ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত।

আল কোরআনের সূরায়ে ন'হলের যে আয়াতটি প্রতি জুমা'র দ্বিতীয় খোৎবার শেষাংশে আমরা শুনে থাকি তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতার সাক্ষী। সেখানে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ-

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ইনসাফ করার জন্যে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করতে। আরো নির্দেশ দিচ্ছেন যাবতীয় অশ্লীলতা, অনৈতিকতা এবং জুলুম ও সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে।" (সূরা আন নাহল-৯০)

রাসূল (সা.) তাঁর উপর অর্পিত নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একটি মানব কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যার গোড়াপত্তনে মূল চালিকা শক্তির ভূমিকায় ছিল তাঁর হাতেগড়া একদল ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী মানুষ। আর এই কাজটির বেশীর ভাগ তিনি সম্পাদন করেছেন অহী প্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার ধারাবাহিকতা যাতে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এজন্যে তিনি তাঁর উম্মতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন। আর তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্দেশনা এসেছে–

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ -

"তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী হয়ে যাও। তোমরা ন্যায়- ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আর সত্যের সাক্ষ্য হয়ে যাও আল্লাহর জন্যে।" (সূরা আন নিসা-১৩৫)

শেষ নবীর উম্মতের হক আদায় করতে হলে, এই পরিচয়ের যথার্থ দাবি পূরণ করতে হলে আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর আলোকে সীরাতে মুহাম্মাদীর উপর গভীর অনুশীলনীর কোন বিকল্প নেই। আর তাঁর সীরাতকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে, অনুধাবন করতে হলে, দীন প্রতিষ্ঠার বাস্তব কাজে অংশগ্রহণ এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি গভীর ও নিবিড় মনোযোগপূর্ণ অধ্যয়ন অপরিহার্য। দ্বিধাহীন চিত্তেই বলতে চাই– দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও সুন্নত তরিকা আসলে কোনটা এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে অহিপ্রাপ্তির দিন থেকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশনার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা এবং রাসূল (সা.) গৃহীত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে,

www.bjilibrary.com

নজুলের তরতিব (ধারাবাহিকতা) অনুযায়ী কোরআন অধ্যয়ন এবং মক্কী-মাদানী অধ্যায়ের বাস্তবতা জনিত পার্থক্যের মাত্রাজ্ঞান অর্জন একান্তই অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহর নবুয়্যতী জীবন বিভিন্ন স্তর

রাসূলে পাক (সা.)-এর নবুওয়াতী জিন্দেগীকে তাঁর জীবনী লেখকদের অনেকেই মক্কী এবং মাদানী এই দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। রাসূলের জীবন মূলত কোরআন কেন্দ্রিক। বরং তার জীবন হল জীবন্ত কোরআন। তাই কোরআনের গবেষকগণ প্রায় সবাই এর কোন অংশ হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে, কোন অংশ হিজরাতের পরে এটা চিহ্নিত করেছেন যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে। এটা শুধু ইতিহাস গবেষণার মাধ্যমে সঠিক ঘটনা জানার জন্যেই নয়। বরং যুগে যুগে মানব সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়ে, চড়াই-উৎড়াইয়ের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে; ইসলামী আদর্শের প্রচার প্রসারে, অনুসরণে ও বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত নীতি- কৌশল অবলম্বনের জন্যেই এটা বেশী প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য।

অহিপ্রাপ্তির পর থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর তার দায়িত্ব পালন শেষে তাঁর মহান মালিকের কাছে চলে যান। সেই ২৩ বছরের ১৩ বছর কেটেছে মক্কায় আর ১০ বছর মদিনায়। মক্কার ১৩ বছরের এই অধ্যায়টি ব্যক্তিগঠন এবং সংগ্রাম যুগ হিসেবে অভিহিত। আর মদিনায় ১০ বছরের অধ্যায়টি পরিচিত বিজয় যুগ তথা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের যুগ হিসেবে। সময় সুযোগ হলে আমরা পরবর্তী কোন সময়ে মাদানী অধ্যায়ে রাসূলের গৃহীত কার্যক্রমের উপর আলোচনার চেষ্টা করব। আজকের নিবন্ধ মক্কী অধ্যায়ের কতিপয় বিশেষ বিশেষ দিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

মক্কী জীবনের চার স্তর

রাসূলে পাক (সা.)-এর মক্কী জিন্দেগীর কার্যক্রমও আবার চারটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম স্তরের তিনটি বছরের কার্যক্রমের মধ্যে আসে হেরার গুহায় অহি নাজিলের ঘটনা, মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর

এর প্রতিক্রিয়ায় মা খাদিজাতুল কুবরার সান্ত্বনা ও ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছ থেকে প্রাপ্ত শুভ সংবাদ। এর পাশাপাশি লক্ষণীয় হলো ঘনিষ্টজনদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বউদ্যোগে ঈমানের ঘোষণা প্রদান। হযরত খাদিজা (রা.) শুধু ঈমানই আনেননি, রাসূলের রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে গোটা অর্থসম্পদ তাঁর কাছে সোপর্দ করলেন– হযরত আবুবকর বিশ্বস্ত ও গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে ঈমান আনলেন। তার সাথে ঈমান আনলেন কিশোর আলী এবং ব্যক্তিগত সেবাকাজে নিয়োজিত যুবক যায়েদ। মূলতঃ মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের কঠিন এই দায়িত্ব পালনের কাফেলার প্রাথমিক সাথী সঙ্গী এই চারজন মানুষ। সংখ্যার বিচারে নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু গুণগত ও মানগত বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মা খাদিজা সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ধনাঢ্য মহিলা–নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার এক অবিসংবাদিত নারী ব্যক্তিত্ব। হযরত আবুবকর (রা.) ঐ জাহেলী যুগেও একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত। হযরত আলী কিশোরদের প্রতিনিধিত্ব করার মত একজন আদর্শ কিশোর। আর হযরত জায়েদ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী (দাস শ্রেণীর) মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি। রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত দীন কায়েমের আন্দোলনের বুনিয়াদ গঠনে এদের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম স্তরের এই তিন বছরে নীরব তৎপরতার বাইরে তেমন কার্যক্রম না থাকায় কাফের ও মুশরেকদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া তেমন বড় রকমের বিরোধিতা দেখা যায়নি।

প্রথমে অহির মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-কে তার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই সাথে ঐ দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুতিমূলক নির্দেশ দেওয়া হয় সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াতের মাধ্যমে, বলা হয়-

يَآأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَأَنْذِرْ – وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ – وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ –
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ – وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ – وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ –

“হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! জড়তা ছেড়ে জেগে ওঠ এবং মানবজাতিকে সতর্ক ও সাবধান কর। ঘোষণা কর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের।

www.bjilibrary.com

তোমার বেশভূষা (আচার আচরণসহ) পূত পবিত্র ও মার্জিত বানাও। পাপ-পংকিলতা ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখ। প্রতিদানের আশায় কাউকে অনুগ্রহ কর না, তোমার রবের জন্যে ছবর কর, ধৈর্য ধারণ কর।" (সূরা আল মুদ্দাসিসর- ১-৭)

সকল নবীই আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে নবুয়াতের ঘোষণা প্রাপ্তির আগেই পূতপবিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাদেরকে মা'সুম বা নিষ্পাপ হিসেবেই আমরা বিশ্বাস করি। অহি প্রাপ্তির পূর্বে প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর মুহাম্মদ (সা.) শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক এবং পৌঢ়ত্বের জীবন কাটিয়েছেন যাদের মাঝে তারা সকলে সাক্ষী। জাহেলিয়াতের কোন পংকিলতাই মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনকে সামান্যতম স্পর্শ করতে পারেনি। অতএব সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াতের নির্দেশনা সরাসরি রাসূলকে সম্বোধন করে দেওয়া হলেও এটা মূলত রাসূলের সাথে যারা এই দায়িত্ব পালনে সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে, ভবিষ্যতেও যারা দীন কায়েমের আন্দোলনে অংশ নেবে তাদের সকলের জন্যে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে সতর্ক সাবধান করার মত কাজের সূচনাতেই বাধা আসতে থাকে। ব্যাপক দাওয়াত না হয়ে সীমিত পরিসরে হওয়ার কারণে বাধার ধরন ছিল মৌখিক গালমন্দ, ঠাট্টা-মসকারা, টিক্কা-টিপ্পনি অপবাদ অপপ্রচারের মধ্যে সীমিত। এই পরিস্থিতি চলতে থাকে চতুর্থ ও পঞ্চম বছর পর্যন্ত। এই রেসালাতের কঠিন গুরু দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী অর্জনের জন্যে এবং অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্ক্ষিত বাক্যবানের মোকাবিলার মানসিক ও মনস্তাত্বিক শক্তিতে বলিয়ান থাকার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে খুবই মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ বাস্তবসম্মত নির্দেশনা আসে সূরায়ে মুযযাম্মিলের ১ম রুকুর মাধ্যমে।

উক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্য খুবই লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াতের মাধ্যমে রাসূলে পাক (সা.)-কে তাঁর উপর অর্পিত কঠিন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রাত্রি জাগরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাত্রির অর্ধেক কিংবা কিছু কম কিছু বেশী সময় জেগে জেগে নামাজ আদায় ও ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে কোরআন

তেলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দিনের বেলায় তো আপনার ব্যস্ততার কোন সীমা নেই। আর রাত্রি বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠার অভ্যাসটি আত্মসংযমের জন্যে খুবই কার্যকর এবং এই নির্জন মুহূর্তে মুখের উচ্চারিত কথাগুলো হয়ে থাকে হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি। যা হৃদয়কে করে থাকে দারুণভাবে আলোড়িত এবং প্রভাবিত।

আট নম্বর থেকে চৌদ্দ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আয়াত-সমূহের মাধ্যমে রাসূলে পাক (সা.) কে আল্লাহর জিকির করতে এবং সৃষ্টি জগতের সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহর দিকে মনে-প্রাণে রুজু হতে বলা হয়েছে। বস্তুজগতের সবকিছুর উপর থেকে নির্ভরশীলতা পরিহার করে পূর্ব পশ্চিম দিগন্তের অর্থাৎ গোটা বিশ্বলোকের মালিক এক আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে রাসূলের রেসালাতের বিরোধিতাকারীদের অশোভন ও অশালীন উক্তি যা মনে দারুণ ব্যথা এবং ক্ষোভের জন্ম দেয় সেগুলো আমলে না নিয়ে ধৈর্য ধারণের জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে-

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا -

"নবুয়্যাতের সত্যতা অস্বীকারকারীদের যাবতীয় কার্যক্রমের মুকাবিলার দায়িত্ব আল্লাহর উপর সোপর্দ করুন এবং এদেরকে কিছু সময় দিন।"

(সূরা আল মুযযাম্মিল-১১)

যার মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ এদের বিররুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেবেন। এদের দৌরাত্ম্য দীর্ঘদিন চলতে পারবেনা। অচিরেই তারা এর পরিণতি ভোগ করবে।

চৌদ্দ থেকে উনিশ নম্বর আয়াতসমূহে রাসূলের আন্দোলন বিজয়ী হবেই এবং তাঁর বিরোধিতাকারীদের শোচনীয় পরাজয় অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী–এই কথা বলার মাধ্যমে যুগপৎ কাফির মুশরেকদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং বিজয়ের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে। ইতিহাস থেকে এই মর্মে শিক্ষা গ্রহণের জন্যেই বলা হয়েছে-

www.bjilibrary.com

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا - فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

"আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি–যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের প্রতি। অতঃপর ফেরাউন উক্ত রাসূলের কথা অমান্য করল– আর তার পরিণতিতে আমি তাকে পাকড়াও করলাম পাকড়াও করার মত।" (সূরা আল মুযযাম্মিল-১৫-১৬)

এর মধ্যে যে পরিষ্কার বার্তাটি আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন তাহলো ফেরাউনের যে পরিণতি হয়েছে আজকে যারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধিতা করছে তাদেরও সেই পরিণতি হবে। দুনিয়ায় যদি কোনক্রমে অনুরূপ শাস্তি থেকে বেঁচেও যায় আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার বা নিষ্কৃতি লাভের উপায় থাকবেনা। শেষোক্ত বক্তব্যটি মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার মত একটি ঘোষণা যাকে আমরা আল্লাহর সর্বোত্তম উপদেশও বলতে পারি। আবার বলতে পারি চেতনা সৃষ্টিকারী একটি স্মারক বক্তব্যও। এর মধ্যে প্রথমাংশে রেসালাতের কঠিন ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে রাত্রির নির্জন নিরিবিলি প্রহরে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় করার চেষ্টার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে প্রতিপক্ষের আচরণের মুকাবিলায় করণীয় প্রসঙ্গে ছবরের তাকিদের পাশাপাশি বিষয়টি পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করতে বলা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে বিরোধী পক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল এবং তার সাথী-সঙ্গীদের বিজয়ের শুভ সংবাদের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের পরাজয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। এটি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তির জন্যে একইভাবে প্রযোজ্য থাকবে।

আমরা এই আলোচনাটা এনেছি রাসূলের মক্কী জিন্দেগীর দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের অবস্থা পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আগত খোদায়ী হেদায়াত সম্পর্কে। ইসলামের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্ট প্রতিকুল পরিবেশে দায়ীকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে যে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে দুটো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

www.bjilibrary.com

এক. একটানা সারারাত জাগতে বলা হয়নি। ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠতে বলা হয়েছে। কারণ অনেকের পক্ষেই সারা রাত জেগে কাটানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একবার আরামের ঘুমের আকর্ষণে পেয়ে বসলে জেগে উঠা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধিই রাত্রি জাগরণের মূল উদ্দেশ্য তাই আরামের ঘুমের মধুর আকর্ষণ উক্ষেপা করে জেগে উঠাই এর জন্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে কার্যকর সহায়ক শক্তি যোগাতে সক্ষম।

দুই. উদ্দেশ্য বা কর্মসূচি বিহীন রাত্রি জাগরণ নয় বরং আল্লাহর কিতাবের মর্ম অনুধাবনের জন্যে নামাজ অবস্থায় তিলাওয়াতই এর লক্ষ্য ও কর্মসূচি। নৈশ ক্লাবে একশ্রেণীর লোক মদ-জুয়ার আসরের মধ্যেও রাত জেগে থাকে। নাচ গানের আসরেও তো রাত জাগে অনেকেই। এই রাত্রি জাগার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পশুশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তার প্রিয় নবীকে– নবীর মাধ্যমে ঈমানদার বান্দাদের যেভাবে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তেলাওয়াতে কোরআন, নামাজ ও জিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন – তার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পাশবিক শক্তির উপরে মানবিক শক্তির কার্যকর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।

এই রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার নির্দেশের যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো-

قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا – نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا – أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا -

“রাত্রি জাগরণ কর অল্প কিছু বাদে। অর্ধেক রাত্রি জাগ অথবা তার কিছু কম অথবা কিছু বেশি আর তারতিলের সাথে বরং তারতিলের হক আদায় করে কোরআন তিলাওয়াত কর।” (সূরা আল মুযযাম্মিল- ২-৪)

আল্লাহর এই নির্দেশের উপর তাঁর রাসূল যে আমল করেছেন, শুধু তিনি নন বরং তাঁর সাথী–সঙ্গীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও যে একইভাবে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন তার সাক্ষী এবং স্বীকৃতি

www.bjilibrary.com

আছে একই সূরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম বাক্যাংশে। আল্লাহ বলছেন-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ -

"হে নবী অবশ্যই তোমার রব এ বিষয়ে অবগত আছেন যে তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, কখনও অর্ধেক রাত কখনও রাতের এক তৃতীয়াংশ জেগে জেগে ইবাদত বন্দেগী করছ। আর সেই সাথে তোমার সাথী সঙ্গীদের একটি অংশও যে একইভাবে রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত- হয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন।" (সূরা আল মুযযাম্মিল-২০)

এখান থেকে রাসূল (সা.)-এর রাত্রি জাগরণের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি সর্বনিম্ন রাতের এক তৃতীয়াংশ জেগেছেন সর্বোচ্চ দুই তৃতীয়াংশের কিছুটা কম। মধ্যবর্তী সময় দেখা যায় অর্ধেক রাত্রি জাগরণের অভ্যাস। যেহেতু ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠাই আল্লাহর হেকমতপূর্ণ নির্দেশ, তাই রাসূল (সা.) রাতের প্রথমাংশে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তেন। আধুনিক প্রগতিশীল লোকদের অভ্যাস অবশ্য উল্টোটা, অর্থাৎ বেশি রাত পর্যন্ত জেগে জেগে অর্থহীন কাজে মাতামাতির পর আল্লাহ যে সময় তার প্রিয় বান্দাদের জেগে থাকা পছন্দ করেন, সেই সময় ঘুমিয়ে যাওয়া। কুফরী শক্তির উপর ইসলামী শক্তির বিজয় লাভের ভিত রচনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে সূরায়ে মুযযাম্মিলের প্রথম রুকুর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর নির্দেশনা নিষ্ঠা ও সার্থকতার সাথে অনুসরণের মাধ্যমে। যা পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলের হাতে গড়া লোকদের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

রাসূল (সা.)-এর মক্কী জীবনের তৃতীয় স্তরটি বাকী তিনটি স্তরের চেয়ে বেশি দীর্ঘ ষষ্ঠ বছর থেকে দশম বছর পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত খুব ব্যাপকভাবে প্রসারিত না হলেও প্রায় সব গোত্রের কিছু কিছু লোক এ দাওয়াতে সাড়া দিতে থাকে। যা মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিরোধিতাও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বিদ্রূপ সমালোচনা এবং গালি-গালাজ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে শারীরিক নির্যাতনও শুরু হয়। শুধু তাই নয় অমানুষিক জুলুম নির্যাতনের

www.bjilibrary.com

ফলে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথী সঙ্গীদের জন্যে মক্কার জমিন সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে আসে। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হল দুই পর্যায়ে রাসূলের (সা.) সাথীদের একটি অংশ হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। আর একটি হল তিন বছরব্যাপী আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে মক্কার কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়।

আবু তালেবের বাসগৃহে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথী সঙ্গীগণ সাংঘাতিক কষ্টের দিন অতিবাহিত করেন। খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে বাধা সৃষ্টির ফলে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণকে গাছের ছাল বাকল খেয়ে ক্ষুধা মিটাতে হয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে তাদের পায়খানা ছাগলের পায়খানার মত দেখাতো। এ সময়ে আর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে তায়েফের বুকে। আল্লাহর রাসূল মক্কাবাসীর ব্যাপারে হতাশ হয়েই তায়েফে যান দাওয়াত দিতে, সেখানকার পাষণ্ড নেতারা শুধু তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি দুষ্ট ও মস্তান মার্কা ছেলে-পেলেদের লেলিয়ে দেয় প্রিয় নবীর উপর ঢিল পাথর মারার জন্যে। তাদের ঢিলের আঘাতে রাসূলের শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে তিনি মাঝে মাঝে বসে পড়েছেন, বেহুশ হয়েছেন। পাষণ্ড জালেমদের নির্যাতন তবুও থামেনি। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল আবার ফিরে আসেন মক্কায়।

এই তৃতীয় স্তরের পাঁচটি বছরে ধাপে ধাপে জুলুম অত্যাচার বাড়তে বাড়তে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু দাওয়াত থেমে থাকেনি। আবু জেহেল ও আবু লাহাব গোষ্ঠীর বিরোধিতা যতই তীব্র হোকনা কেন তারা ভেতর থেকে এক অজানা ভয়ে স্নায়ূ চাপে ভুগতে থাকে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বৈঠকে মিলিত হয় মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণের জন্যে। একদিকে আপোষের প্রস্তাব নিয়ে যায় রাসূলে পাকের কাছে, অপর দিকে এ কৌশলে ব্যর্থ হলে অপবাদ আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনমত বিভ্রান্ত করার কৌশলও তারা নির্ধারণ করে। সূরায়ে হা-মিম-আস্‌সাজদায় তাদের এই কৌশলের বর্ণনা আসছে এভাবে (অবশ্য এটি এই স্তরের একেবারে প্রাথমিক দিকের কথা)–

www.bjilibrary.com

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ـ

"কাফেররা বলে এই কোরআন তোমরা শুননা বরং শোনার পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর গণ্ডগোলের মাধ্যমে যাতে করে তোমরা বিজয়ী হতে পার।" (সূরা ফুচ্ছিলাত-২৬)

আল্লাহ তায়ালা তাদের এই অপকর্মের জন্যে যে শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন সেটার উল্লেখের পর এই জালেমদের যারা দুনিয়ায় অনুসরণ করে আখেরাতে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পর্কে কি ক্ষেদোক্তি করবে তার বর্ণনা দিয়েছেন চমৎকারভাবে:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ـ

"কাফেরগণ কিয়ামতের দিন বলবে আল্লাহ আজ আমাদের জিন ও ইনসানের মধ্য থেকে ঐসব লোকদের একটু দেখাও যারা দুনিয়ায় আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। আমরা যেন তাদেরকে পায়ের তলায় ফেলে নিষ্পিষ্ট করতে পারি আর তারা যেন নিক্ষিপ্ত হয় ধ্বংসের অতল তলে।" (সূরা আল ফুচ্ছিলাত-২৯)

এই জালেমদের সীমাহীন জুলুম উপেক্ষা করেও যারা আল্লাহকে রব বলে ঘোষণা দিয়ে চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়– তাদের প্রশংসা ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ـ

www.bjilibrary.com

"যারা এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর এর উপর সুদৃঢ় অবস্থান নেয়, তাদের উপর নাজিল হয় আল্লাহর রহমতের ফিরিশতা, তারা শুভ সংবাদ শোনায়, তোমাদের কোন ভয় নেই কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হয়েছে। আমরা তোমাদের বন্ধু এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও, ঐ জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে তাই পাবে সেখানে থাকবে তোমার সকল চাওয়া পাওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি। এটা হবে পরম দয়ালু এবং ক্ষমাশীল রবের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে বিশেষ আতিথেয়তা।" (সূরা ফুচ্ছিলাত-৩০-৩২)

এই স্তরে প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা ঈমানের দাবি পূরণে সর্বোচ্চ ছবর ও ইস্তেকামাত বা সহনশীলতা ও দৃঢ়তার সাথে ঈমানের দাবি পূরণে সক্ষম হয় তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত, করুণা, পুরস্কার ও আতিথেয়তার শুভ সংবাদ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে দাওয়াতের ফজিলতের আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। বলা হয়েছে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

"তার চেয়ে আর কার কথা অধিকতর উত্তম যে মানবজাতিকে আহ্বান জানায় আল্লাহর দিকে আর নিজেও আমলে সালেহ করে আর ঘোষণা করে আমি মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ফুচ্ছিলাত-৩৩)

যে পরিস্থিতিতে দাওয়াতের এই নির্দেশনা এসেছে তা উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয়। প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ, অপপ্রচার দুর্ব্যবহার থেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত ছিল এসময়ের ঈমানদারদের নিত্যকার সাথী। এহেন মুহূর্তে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তিদের জন্যে হেদায়াত আসছে ভাল কাজ আর মন্দ কাজ এক বরাবর নয়। অতএব মন্দের মুকাবিলা করতে হবে উত্তম আচরণের মাধ্যমে, তাহলে দেখতে পাবে জানের শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। কাজটি খুব একটা সহজ নয়, এমনটি তো তারাই করতে পারে যারা ধৈর্য এবং সহনশীলতার অধিকারী, যারা প্রকৃতই ভাগ্যবান। যদি এ সময়ে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন রূপ উস্কানী আঁচ করতে পার তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও তিনি সর্বোত্তম

www.bjilibrary.com

শ্রবণকারী (কারো ডাকে সাড়াদানকারী) এবং সর্বোচ্চ জ্ঞানী; তোমাদের অবস্থা তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না।"

এই পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.) এর আন্দোলন মক্কায় দশ বছরের কঠিন কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বছরে অর্থাৎ মক্কা জিন্দেগীর চতুর্থ বা শেষ স্তরে পদার্পণ করে। ক্রমাগতভাবে প্রতিপক্ষের সৃষ্ট প্রতিকূলতা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নেয়। জাগতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এই পরিস্থিতিতে সাফল্যের ন্যূনতম সম্ভাবনাও আঁচ করা সম্ভব ছিল না। কাফের মুশরিকদের নেতারা অবশেষে আল্লাহর রাসূলের জন্যে মক্কার জমিন করে ফেলে একেবারেই সংকীর্ণ। এই চতুর্থ স্তরের দু'টি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটি মেরাজুন্নবী আর অপরটি হল হিজরাত। মেরাজের মাধ্যমে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে নিজ সান্নিধ্যে নিয়ে দুনিয়ার বস্তুগত কার্যকারণের উর্ধ্বে আল্লাহর কুদরতে কামেলার কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করে আস্থাশীল ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবার ব্যবস্থা করেন।

সকল শক্তির উৎস আল্লাহ। তাঁর শক্তিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। তিনিই রাসূলকে পাঠিয়েছেন তার দীনকে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। অতএব এ দীন বিজয়ী হবেই। তাই প্রতিপক্ষের চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল যতই বিস্তৃত হোক না কেন, এতে হতাশ হওয়া বা বিচলিত হবার কিছু নেই। রাসূলের এই মে'রাজের মাধ্যমে ঈমানদারদের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় হিসেবে নামাজ ফরজ করা হল। আল্লাহর রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামগণ আগেও নামাজ পড়তেন। কিন্তু নিয়মিত দিনে পাঁচবার বাকায়দা নামাজ চালু হয় মেরাজের পর থেকেই। অহির সূচনা লগ্ন থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে পর্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ বছরে এসে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর মিশনকে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন। হিজরতের পর মদিনায় যে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সূচনা হয় তার মূলনীতি তিনি প্রাপ্ত হন 'সূরাতুল আসরা'র মাধ্যমে যা নাজিল হয় মি'রাজের অব্যবহিত পরেই।

মক্কী জীবনের কার্যধারার বৈশিষ্ট্য

আমরা নবী করিম (সা.) এর মক্কার এই তের বছরের জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করে আলোচনার চেষ্টা করেছি। মূলত এর একটা আরেকটার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত একই ঘটনার ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। আল্লাহর প্রিয় রাসূল শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে ঈমানদারদের একটি কাফেলা এই চারটি স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী বিরল চরিত্রের অধিকারী হল। তারা সজ্জিত হল সকল বিচারে সর্বোন্নত মানবীয় গুণাবলীতে। যা চরম প্রতিপক্ষ ও বৈরী শক্তির উপরও নৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। আল্লাহ স্বয়ং তাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নত নীতি-নৈতিকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন, এবং তাদের মানুষ হিসেবে সফলকাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে আল মু'মিনুনের প্রথম দশটি আয়াতের এবং সূরায়ে আল ফোরকানের শেষ রুকুর বাচনভঙ্গি থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে রাসূলের সাহাবাগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে ঐ গুণাবলী অর্জন করে মূলত এটাই প্রমাণ করেছেন যে নবীর দাওয়াত হক এবং তা অবশ্যই বিজয়ী হবে।

মক্কী অধ্যায়ের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে নাজিলকৃত দুটি সূরার যে অংশে ঈমানদারদের অর্জিত গুণাবলীর আল্লাহ প্রশংসা করেছেন তার সার কথা হল "ঐ সব ঈমানদারগণ অবশ্যই সফলকাম যারা নামাজে বিনয়ী, যারা অর্থহীন কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, যারা আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত, যারা যৌনাংগের হেফাজতকারী, যাদের যৌন আচরণ সংযত এবং আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মধ্যে সীমিত, যারা আমানত এবং ওয়াদা রক্ষাকারী যারা নামাজের হেফাজতকারী"। আর সূরায়ে ফোরকানের নির্দেশনায় ভাষার পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য একই। সেখানে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ "রহমানের বান্দারা বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী। দুষ্ট বা অজ্ঞ লোকদেরকে তারা কৌশলে এড়িয়ে চলে, তারা রাত্রি জাগরণ করে রুকু এবং সেজদার মাধ্যমে আর আল্লাহর কাছে পানাহ চায় দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে। অর্থনৈতিক জীবনে তারা স্বচ্ছতার অধিকারী এবং মিতব্যয়ী। তারা বাহুল্য ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, তারা অবলম্বন করে মধ্যপন্থা। তারা আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে কাউকে শরীক করে না, মানুষ হত্যা করে না, যেনা করে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না" প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে একান্তই বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী। আর এটাই প্রমাণ ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের। আর এটাই রচনা করে ইসলামের বিজয়ের মূল ভিত্তি।

আজকের দিনেও যারা ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার প্রত্যাশা বা স্বপ্ন বুকে লালন করে তাদেরকে এই ভিত রচনার কাজকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

বর্তমানে মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের জন্যে মক্কী জিন্দেগীর মডেল অনুসরণের ক্ষেত্রে তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্যে মক্কী ও মাদানী অধ্যায়ের বিভাজন বেশ জটিল। এ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিতর্কের সুযোগ আছে। ইসলামী হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই আমরা মাদানী অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই এখানে। কিন্তু এরপরও মূলকথা হল ইসলাম কায়েম নেই যেখানে, যেখানে ইসলামী শক্তি আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় নেই, ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে সেটাকে অবশ্যই মক্কী অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং আন্দোলনের নীতি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে এর আলোকেই।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের প্রায় সবাই রাসূলে পাকের মক্কী জীবনের সাথে মাদানী জিন্দেগীর অসংগতি এবং এবং ভিন্নতা প্রমাণের অপ্রয়াস চালিয়েছেন। এটা হয় তাদের অজ্ঞতার ফল, আর না হয় তাদের ইচ্ছাকৃত তথ্য বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ভাষায় রাসূলের মক্কার তৎপরতা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ আর মদিনার জীবনে দেখা যায় রাজনীতির প্রাধান্য। বাস্তবে এ রকম পার্থক্য সৃষ্টির আদৌ কোন সুযোগ নেই। একটি প্রাসাদকে যেমন তার ফাউন্ডেশন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে মক্কায় ব্যক্তি গঠন ও মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধিমূলক কার্যক্রমকে কিছুতেই আলাদা করার সুযোগ নেই। রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের যে পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দশ বছরে, মক্কার তের বছরের কার্যক্রম ছিল মূলত তারই প্রস্তুতি পর্ব।

মক্কার জীবনে তৌহিদের দাওয়াত এবং আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টির সাথে এ দাওয়াত কবুলকারীদের চরিত্র গঠনের এই কর্মকাণ্ডকে আবুজেহেল আবু লাহাবের গোষ্ঠী নীরবে সহ্য করতে ব্যর্থ হল কেন? কেন এই দাওয়াতের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল নির্মমতা ও পৈশাচিকতার সকল সীমা অতিক্রম করে? অথচ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) শিশু থেকে কিশোর এবং কিশোর থেকে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাদের কাছে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবেই স্বীকৃত ছিলেন। কারণ একটাই। ইসলামের মূল দাওয়াতের মধ্যেই মানুষের সমাজে একটি আমূল পরিবর্তনের বীজ নিহিত। যার প্রতিফলন ঘটেছে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ এটা অনুধাবনে ব্যর্থ হলেও আবু জেহেল আবু লাহাব গং এটা যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

www.bjilibrary.com

(২)

আল কোরআন নাজিল ও বিরোধিতা

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা

আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার সকল সৃষ্টির সেরা মানুষ। মানুষ এ মাটির পৃথিবীতে তার খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সাহায্য করার জন্যে, বাস্তবে শিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়ার জন্যেই নবী রাসূল প্রেরণের ও আসমানী কিতাব নাজিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মানুষের আদি পিতা আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় প্রেরণের মুহূর্তেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ... قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

"তোমাদেরকে কিছু দিনের জন্যে অবস্থান করতে হবে এই মাটির পৃথিবীতে। তোমাদের ভোগদখলে থাকবে কিছু ক্ষণস্থায়ী সম্পদ অত:পর ফিরে আসতে হবে আমার কাছেই। ...এমতাবস্থায় তোমাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত বা পথ নির্দেশনা যাবে। যারা এর অনুসরণ করবে, তাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। থাকবে না কোন দুশ্চিন্তা।"

(সূরা আল বাকারা- ৩৬-৩৮)

বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রথম ব্যক্তিটিই দুনিয়ায় আসেন তাঁর নবী হিসেবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্যে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। সকল নবীই আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এবং নিযুক্ত। দুনিয়ায় ব্যক্তিগত সাধনা বলে কেউ নবী হননি।

www.bjilibrary.com

সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের মহান শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ কোন ফিরিশতাকে নবী হিসেবে না পাঠিয়ে মানুষকেই এ দায়িত্ব দিয়েছেন। যাতে মানুষ এটা না মানার কোন অজুহাত তালাশ করতে না পারে। নবী রাসূল হিসেবে দুনিয়ায় মানব জাতির মহান শিক্ষকের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন, তাদের এই মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত। নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যেই তাদের আগমন ঘটেছে দুনিয়ায়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত কেউই জানতেন না, তাদের উপরে কত বড় দায়িত্ব দেওয়া আছে, তাদের রবের পক্ষ থেকে। নবী রাসূলগণ তাদের উপর অর্পিত রেসালাত ও নবুওয়াতের দায়িত্বের কথা অহি প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জানতে না পারলেও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ হেফাজতে ও ব্যবস্থাপনায় তারা নিষ্পাপ জীবনের অধিকারী ছিলেন চরম জাহেলি সমাজেও। তাই সকল নবীকেই আমরা মাসুম বা নিষ্পাপ মনে করি ঈমান বির্‌রিসালাতের অঙ্গ হিসেবেই।

নবুয়্যত পূর্ব জীবন ঃ একটি সমীক্ষা

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মলগ্ন থেকে অহি প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবনটাও লক্ষণীয়। দুনিয়ায় আগমনের আগেই পিতৃহারা। শিশু অবস্থায় মাতৃহারা, দাদা এবং চাচার আদরে বেড়ে উঠেন ইয়াতিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। শিশুদের মধ্যে তার আচরণ ব্যতিক্রমধর্মী। কিশোরদের মধ্যে তার কর্মকাণ্ড পরিচ্ছন্ন। স্বচ্ছ অনুকরণীয়, অনুসরণীয় যুবক মুহাম্মদ বড়দের স্নেহধন্য, সমবয়সীদের প্রিয়পাত্র আর ছোটদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সকলের হৃদয়ে হন সুপ্রতিষ্ঠিত। পাপ পংকিলতা ও মিথ্যার সয়লাবে নিমজ্জিত সমাজের মানুষ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাকে সম্বোধন করেন আল আমিন-আসসাদেক হিসেবে। আল্লাহর বিশেষ হিফাজতে তাঁর সর্বশেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী নবুওয়াতের ঘোষণা প্রাপ্তির আগেই মানুষের একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ও সত্যনিষ্ঠ সাথী হিসেবে স্বীকৃতি পান সর্বস্তরের জনমানুষের কাছে। কাবা বায়তুল্লাহর সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হবার পর হাজরে আসওয়াদকে তার নির্ধারিত স্থানে পুনস্থাপনের বিষয়টি নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের অবসান ঘটান আল্লাহ তারই মাধ্যমে। এটাও সম্ভব হয়েছিল মূলত তার প্রতি সৃষ্টি হওয়া স্বতঃস্ফূর্ত আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-

www.bjilibrary.com

এর অহিপূর্ব জীবনকে সামনে রেখে আমরা দুটো বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। এর একটি হল মানুষের বিবেক সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি হল, অহির জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, সেই প্রসঙ্গে।

মানুষের বিবেক সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে জন্মগতভাবে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে বাছ-বিচার করার একটি শক্তি দিয়েছেন। আমরা ওটাকেই বলতে চাই বিবেক। আর এই বিবেকের বলেই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা এবং সেরা। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হেদায়াতের বাণী মানুষের এই বিবেককেই শক্তি যোগায়। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে মানুষের বিবেক কখনও চাপা পড়ে যেতে পারে, অকার্যকর হতে পারে। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর বাস্তব প্রমাণ সেই অন্ধকার যুগের লোকদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে আল আমীন ও আস সাদেক হিসেবে সম্মানের আসনে স্থান দেওয়া। তারা নিজেরা মিথ্যায় নিমজ্জিত ছিল, নিমজ্জিত ছিল পাপ পংকিলতার অতল তলে, এরপরও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর সততা সত্যবাদিতা ও পূত পবিত্র জীবনের স্বীকৃতি দিতে তারা ব্যর্থ হয়নি। এ থেকে আমরা এ শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারি, মানুষ সম্পর্কে হতাশ নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন যতই কলুষিত হোক না কেন, মানবতা ও মনুষত্বের জীবন্ত নমুনা তাদের সামনে উপস্থাপিত হলে তারা একদিন এর স্বীকৃতি দিতে অবশ্যই এগিয়ে আসবে।

অহির জ্ঞান ছাড়া আন্তরিকতা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং জনসমর্থন থাকলেও যে মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তার একটা বাস্তব প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই শেষ নবীর অহি পূর্ব জীবন থেকে। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দরদেভরা এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। যে হৃদয় দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষের দুর্দশা দুর্গতির করুণ অবস্থা। গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছেন এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্যে। এই চিন্তা-ভাবনারই এক পর্যায়ে প্রায় ১৭ বছর বয়সে তিনি শরীক হন বা গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান। অহি প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কাল হয় প্রায় ২৩ বছর। অকুণ্ঠ আস্থার প্রতীক হয়েও তিনি মানুষের মুক্তির জন্যে স্বীয় সাধনায় তেমন কোন উন্নতি অগ্রগতি দেখাতে পারেননি।

www.bjilibrary.com

অপর দিকে অহির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের ভিত্তিতে যাত্রা শুরু করে চরম বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া সত্বেও, সীমাহীন জুলুম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও, এক পর্যায়ে বাপ দাদার ভিটা মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পরও, তিনি মানুষকে সত্যিকারের শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিশেষ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা যারা কামনা করেন, তাদের সকলের উচিৎ রাসূল (সা.)-এর জীবনের এই দুটি দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা পরিহ-ার করে। এবং মানুষের ত্রাণকর্তা রহমাতুল্লিল আ'লামীনের জীবন থেকে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা নেওয়া।

অহির জ্ঞান সরাসরি প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মনের ষোল আনা আবেগ অনুভূতি নিয়ে মানুষের কল্যাণ চিন্তার এক পর্যায়ে এগিয়ে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার মুহূর্ত। এই সময়ে দ্রুত গতিতে মানুষের সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার এক পর্যায়ে তিনি নির্জন বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এবং হেরার গুহায় গিয়ে সময় কাটানো শুরু করেন। অহির সূচনা হয় মূলত সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। একটি পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের স্বপ্ন প্রকাশ্য দিবালোকের মত সত্য বিবেচিত হতে থাকে। মূলত এই মানসিক অবস্থা নিয়ে তিনি হেরায় গিয়ে একাকী সময় কাটাতেন। আবার ফিরে আসতেন বিবি খাদিজার কাছে। আবার কয়েক দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রি নিয়ে চলে যেতেন ঐ নির্জন নিরালায় অদৃশ্য ঐশী আকর্ষণে। তিনি হেরায় অবস্থানকালে যা করতেন হযরত মা আয়েশা এটাকে তাহান্নুস নামে অভিহিত করেছেন যার আরবী প্রতি শব্দ তায়াব্বুদ, ইবাদত থেকে শব্দটি উদ্ভূত। এই ইবাদতের ধরন প্রকৃতি কি ছিল এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত কিছু জানার সুযোগ নেই। কারণ তখন পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে ইবাদতের কোন প্রক্রিয়া তিনি প্রাপ্ত হননি। মূলত তিনি সৃষ্টি জগতের সকলের জন্যে রহমতের বার্তা বাহক। সৃষ্টির অকল্যাণ দূর করে কল্যাণ কিভাবে করা যায় সেই পথের সন্ধানেই আল্লাহর শরনাপন্ন হতে বার বার ছুটে গেছেন সেখানে এবং নিমগ্ন হয়েছেন গভীর ধ্যানে।

www.bjilibrary.com

অহি (কুরআন) নাজিল

এই অবস্থাতেই একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি নাজিল হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ফিরিশতা এসে বলল আপনি পড়ুন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, এরপর রাসূল (সা.) বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। এরপর ফিরিশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে সজোরে চাপ দেয়, যে চাপ ছিল– আমার বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত। এরপর ছেড়ে দিয়ে আবার বলল পড়ুন! আমি বললাম আমি তো পড়তে পারি না। আবার আমাকে চেপে ধরে, যা ছিল আমার সহ্য সীমার চেয়ে অনেক বেশি। আমি আবারও বললাম আমি তো পড়তে পারি না। এভাবে তৃতীয় বারের মত আমাকে চেপে ধরে বলল, আপনি পড়ুন! এবং এই মুহূর্তে ফিরিশতার কণ্ঠে উচ্চারিত হল সূরায়ে আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔

"পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতিকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে, পড়ুন! আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে দিয়েছেন এমন শিক্ষা যা তার জানা ছিল না।" (সূরা আল আলাক ঃ ১-৫)

হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সা.) বেশ কিছুটা ভীত শংকিত হয়ে পড়েন। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পৌঁছেন খাদিজার কাছে এবং তাকে বলতে থাকেন আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। এই ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়ার পর তিনি খাদিজার কাছে ব্যক্ত করলেন, হে খাদিজা! এ আমার কি হল? এর পর হেরার গুহায় সংঘটিত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বললেন আমার তো জীবনেরই আশঙ্কা হচ্ছে!" এই সময়ে আল্লাহর রাসূলের জীবন সঙ্গীনী বুদ্ধিমতি খাদিজা প্রিয় নবীকে কী ভাষায় সান্ত্বনা দিলেন– তা আমাদের সকলেরই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা দরকার।

www.bjilibrary.com

তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে বললেন, "না, এমনটি হতেই পারে না। আপনি খুশি হয়ে যান। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনও অসম্মান করবেন না।" এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে আর যা যা বললেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মা খাদিজা বলে চললেন, "আপনি আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল আচরণ করেন, সত্যকথা বলেন, অন্য এক বর্ণনা মতে আপনি মানুষের আমানতের হেফাজত করেন এবং যথাসময়ে তা আদায় করে থাকেন, অসহায় ও সম্বলহীন মানুষকে আপনি আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। গৃহহীন, সম্বলহীন লোকদেরকে নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে সাহায্য করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, সৎ কাজে মানুষকে সাহায্য করে থাকেন।"

এখানে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন সঙ্গীনী হিসেবে খাদিজা (রা.) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। এক অতুলনীয় মানবীয় গুণাবলীর মূর্তপ্রতীক ছিলেন তিনি। অহির মাধ্যমে নবুয়্যাতের ঘোষণা প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই। এর ভিত্তিতেই খাদিজা (রা.) পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পেরেছেন, "আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনও অসম্মান করবেন না"। রাসূলের দাওয়াতের পতাকাবাহী যারা হবেন তাদেরকেও ঐসব মানবীয় গুণের অধিকারী হতে হবে। রাসূলের সার্থক অনুসারী ও উত্তরসূরী হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যে।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর পর মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে গেলেন তার নিকট আত্মীয় বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল-এর নিকট। তিনি আরবী এবং ইবরানী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন– আরবী এবং ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল কিতাব লেখার কাজও করতেন। হযরত খাদিজা ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে তাঁর স্বামীকে উপস্থিত করে বললেন; ভাইজান উনার কি হয়েছে শুনুন। ওয়ারাকা রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বলুন তো দেখি কি হয়েছে, কি দেখেছেন। রাসূল (সা.) হেরার গুহায় যা যা দেখেছেন অকপটে তার কাছে ব্যক্ত করলেন। সব শোনার ফলে ওয়ারাকা বললেন এতো সেই ফিরিশতা যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছিলেন। আপনার নবুওয়তের সময় যদি আমি শক্ত সামর্থ ও যুবক থাকতাম, তাহলে আপনাকে সহযোগিতা করতাম। আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওমের লোকেরা দেশ

www.bjilibrary.com

ত্যাগে বাধ্য করবে। রাসূল (সা.) ওয়ারাকাকে এই পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা আমাকে বের করেই দেবে? হ্যা তাই করবে। অতীতে এ পয়গাম নিয়ে যারা এসেছে যা আপনিও নিয়ে এসেছেন, তাদের সাথে তাদের কওমের লোকেরা শত্রুতা করেছে। যদি আমি আপনার সময়টা পাই তাহলে আমি অত্যন্ত জোরে শোরেই আপনাকে সহযোগিতা করব। কিন্তু এরপর ওয়ারাকা আর বেশি দিন জীবিত থাকেননি।

আসমানী কিতাবের জ্ঞানের আলোকে অতীতে নবী রাসূলগণের সাথে তাদের কওমের লোকেরা কেমন ব্যবহার করেছে– সে সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি উপরোক্ত ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। যা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবে সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। অহির সূচনা পর্বের ঘটনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে– মুহাম্মদ (সা.)-এর আগে ঘূর্ণাক্ষরেও এটা জানতে পারেননি যে তার উপরে এত বড় কঠিন একটি দায়িত্ব আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। অহি প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তার আচার আচরণকে কেন্দ্র করে কারো পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করারও কোন সুযোগ রাখা হয়নি যে, সেতো আগে থেকেই কিছু একটা দাবি করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই আগের কথাটির আবারো পূনরাবৃত্তি করতে চাই, নবুওয়তের বিষয়টি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত বিষয় এটা কোন মানুষের চেষ্টা সাধনার ফসল নয়। যাকে তিনি এই নিয়ামত বা দায়িত্ব অর্পণ করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে থেকে যান সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। নিজের সহধর্মিনী ১৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যিই উপলব্ধি করেছিলেন তার স্বামীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীরই প্রকাশ ঘটেছে হেরার গুহার উক্ত ঘটনার মাধ্যমে যা সত্যায়িত করলেন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল অতীতের আসমানী কিতাবের শিক্ষার আলোকে। অতএব শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)।

অহির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বার্তাটি প্রথমবারের মত নবী মুহাম্মদ (সা.) প্রাপ্ত হলেন তাতে প্রভুর নামে পড়তে বলা হয়েছে এবং সেই সাথে প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– তিনি মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে জ্ঞানদান করেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মূলত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হল "তুমি যে মানবজাতির দুর্দশা-দুর্গতি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

www.bjilibrary.com

মানুষের সমাজের যে চরম অশান্তি-অনাচার তোমার হৃদয়কে যে ব্যথিত করেছে, যে অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাতো কেবল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে।

আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর হৃদয় মন মানবজাতির জন্যে দরদে ভরপুর। মানুষের কষ্টের দৃশ্য তার মনকে করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি ব্যথাকাতর। আল্লাহ নিজের ভাষায়ই তা উল্লেখ করেছেন এভাবে-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ-

"তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল (সা.) এসেছেন- তোমাদের দুঃখ-যাতনা যার কাছে বড়ই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের সকলের কল্যাণকামী, বিশেষ করে ঈমানদারদের প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান।" (সূরা আত তওবা-১২৮)

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর হৃদয়-মন তো আল্লাহরই নেয়ামত, তার এই পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ -

"আল্লাহর বিশেষ রহমতের ফলে তোমার হৃদয়টি মানবজাতির জন্যে কোমল করে দেওয়া হয়েছে"। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৯)

নবুওয়তের ঘোষণা আসার সময়টি যত এগিয়ে এসেছে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর দরদী মনের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অস্থিরতাই তাকে হেরার গুহায় টেনে নিয়েছে। তাই অহির সূচনা বাক্যসমূহ যতই সংক্ষিপ্ত হোকনা কেন, অহির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যতটাই ভীতিপ্রদ হোকনা কেন, বিবি খাদিজা ও ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের বক্তব্য ও সান্ত্বনাবাক্য তাঁর হৃদয়ে এনে দেয় এক অনাবিল প্রশান্তি ও প্রশস্তি যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তবে হৃদয়বান ব্যক্তিদের পক্ষে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

কিন্তু প্রথম অহির পর আবার কিছু দিন অহিপ্রাপ্তি বন্ধ থাকে। অবশ্যই এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন হিকমত রেখেছেন। মানবীয় বুদ্ধি বলে আমরা তার কারণ কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেও পারি। কিন্তু আসল হিকমত, আসল তাৎপর্য-এর মালিক-মোখতার মহান আল্লাহই জানেন। অহি প্রাপ্তির মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মনে শান্তি ও স্বস্তি আসে, আসে অসহায় মানবজাতিকে পথ দেখাবার আলোর দিশা। সাময়িকভাবে অহি প্রাপ্তি বন্ধ হওয়ার ফলে আবার সেই পেরেশানী বাড়তে থাকে। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনামতে এ সময়ে আল্লাহর রাসূল এতটাই অস্থির হয়ে পড়তেন যে তিনি এই অস্থিরতা নিয়ে ছুটে যেতেন পাহাড়ের চূড়ায়। আর তখনই তাকে গায়েব থেকে বলা হতো তুমি আল্লাহর নবী। একপর্যায়ে রাসূল (সা.) আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তীস্থানে ঐ ফিরেশতাকে দেখতে পান যিনি হেরার গুহায় এসেছিলেন প্রথম অহি নিয়ে। এই সময়েই নাজিল হয় সূরায়ে মুদ্দাচ্ছিরের প্রথম সাতটি আয়াত–যাতে নবুওয়তের এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে সকল জড়তা ভয়ভীতি পরিহার করে জেগে উঠতে বলা হয়। বলা হয় মানবজাতিকে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম প্রতিফল সম্পর্কে সতর্ক সাবধান করার জন্যে। আরো নির্দেশ দেওয়া হয়– দুনিয়ার অশান্তি ও দুর্দশা দুর্গতি থেকে মুক্তি পেতে হলে এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই পরিচালনা করতে হবে মানুষের সমাজকে।" এ কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে নবী মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ দায়িত্ব পালনের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ তাকে পূতপবিত্র জীবনের অধিকারী হতে হবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টিজগতের কারো কাছ থেকে কোন প্রকারের প্রতিদানের আশা ছাড়াই মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কাজটি মানুষের কল্যাণের জন্যে হলেও এ পথে বাধা আসবে। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী যারা মানুষের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে, তারা এটা অতীতেও সহ্য করে নাই, এখনও করছে না, ভবিষ্যতেও করবে না। তাদের পক্ষ থেকে তাই চতুর্মুখী বাধা প্রতিবন্ধকতা আসবেই। তাই নবী হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রাথমিক নির্দেশনাতেই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উপর তাগিদ দেন এবং সেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যেন হয় কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যেই, এটা স্পষ্ট করে বললেন, কারণ একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যাবতীয় কর্মকাণ্ড যাদের

www.bjilibrary.com

নিবেদিত নয়– তাদের পক্ষে এই সব কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা, ছবর ও ইস্তেকামাতের পরম পরাকাষ্ঠা দেখানো কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

আল্লাহর রাসূলের উপর যখন অহি নাজিল হত, তখন তার মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত-যার প্রকাশ ঘটতো রাসূলের শরীরের উপরও। এমনকি তিনি উটের উপর আরোহণরত অবস্থায় অহি নাজিল হলে, তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া উটের উপরও পরিলক্ষিত হতো। অনেক মোফাসসেরদের মতে এ কারণেই প্রথম দিকে একটানা অহি নাজিলের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা কিছু সময় বিরতি দিয়ে-দিয়েই অহি নাজিল করেছেন। এই বিরতির কারণেও আল্লাহর রাসূলের মধ্যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়েছে। সেই পেরেশানীরই প্রকাশ পায় চাদর মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে–মনোঃকষ্ট হজমের একটি মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে। রাসূলের এ অবস্থারই সার্থক বর্ণনা- ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্‌সিরু” বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

অহি প্রাপ্তি বন্ধের কারণে রাসূলের হৃদয়ে সৃষ্ট পেরেশানী দূর করার জন্যে সূরায়ে দোহায় আল্লাহ তায়ালা রাসূলের প্রতি তার মেহেরবাণীর উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষা ও নৈপুণ্যের মাধ্যমে।

وَالضُّحٰى – وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى – مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى – وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰى – وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى – أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوٰى – وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى – وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى – فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ – وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ – وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ –

“শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং রাতের যখন তা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (হে নবী) তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তোমার পরবর্তী অবস্থা হবে প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম ও কল্যাণময়। আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দিবেন যে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তিনি কি তোমাকে ইয়াতিম রূপে পাননি? অতঃপর আশ্রয় দেননি? তিনি তো তোমাকে পেয়েছেন–এমন অবস্থায় যে সঠিক পথের সন্ধান তোমার জানা ছিল না। অতঃপর তোমাকে সঠিক পথের

www.bjilibrary.com

(সিরাতে মুস্তাকিমের) সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তো তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব দরিদ্ররূপে– অতঃপর তোমাকে সচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর নির্দয় আচরণ করবে না এবং কোন অভাবগ্রস্ত সাহায্য প্রার্থী মানুষকে ধিক্কার দিওনা বা তিরস্কার করো না। আর তোমার প্রতি তোমার রবের নিয়ামতকে প্রকাশ করতে থাক।" (সূরা আদ দোহা-)

সূরায়ে দোহার এই নির্দেশনার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং পরিপূরক নির্দেশনা এসেছে সূরায়ে 'আল ইনশিরাহ'র মাধ্যমে।

অহীর দাওয়াত ও বিরোধিতা

সূরায়ে মুদ্দাস্‌সিরের মাধ্যমে সতর্ক করণের নির্দেশনার প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে হেদায়াতের এক পর্যায়ে বলা হয়েছিল "এবং তোমার রবের জন্যে ছবর কর"। মূলত নবী হিসেবে মানবজাতিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ককরণের কাজ অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই সমাজে পর্যায়ক্রমে শুরু হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আমরা ইতোপূর্বের নিবন্ধে রাসূলের মক্কার জীবনের চারটি অধ্যায়ের আলোচনা করেছি। তাতে বলা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিছুটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ছাড়া। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, তা ছিল বিরূপ সমালোচনা, অপবাদ ও মিথ্যা রটনা যা রাসূলের মনের উপর মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করত।

সূরায়ে দোহায় যে সান্ত্বনা বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা ছিল প্রধানত অহি বন্ধের কারণে সৃষ্ট ব্যথা বেদনা দূর করার জন্যে, আর সূরায়ে 'আল ইনশিরাহ' তে যে সান্ত্বনাবাণী শোনানো হয়েছে– তা ছিল মূলত রাসূলের রেসালাত অস্বীকারকারীদের অবান্তর মন্তব্য, কদর্য সমালোচনা ও মিথ্যা প্রচারণার কারণে সৃষ্ট ব্যথা বেদনা ও কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার বক্তব্য এবং বর্ণনাভঙ্গি একান্তই আল্লাহর নিজস্ব কথা। এর সাথে মানব রচিত কোন কথা কোন ভাষার তুলনাই হতে পারে না। কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই দাওয়াতের ময়দানে বিচরণকারী যে কোন ব্যক্তি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই হেদায়াতের যথার্থতা হৃদয় দিয়ে

www.bjilibrary.com

উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন-

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ - الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ -

"হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্যে প্রশস্ত করে দেইনি, আর উঠিয়ে নেইনি সেই বোঝা যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল? আর তোমারই জন্যে তোমার আলোচনাকে কি স্থান দেইনি সবার উপরে? অতএব বাস্তব সত্য হল সংকীর্ণতার সাথেই আছে প্রশস্ততা। সন্দেহই নেই সংকীর্ণতার সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা। অতএব যখনই অবসর পাও তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে এবং তোমার রবের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে আকৃষ্ট হবে।" (সূরা আল ইনশিরাহ- ১-৮)

উপরোক্ত দুই সূরার পাশাপাশি আর একটি অত্যন্ত ছোট সূরার শিক্ষাকেও আমরা সামনে রাখতে পারি আমলি জিন্দেগীর পথে প্রান্তরে। সেটি হল সূরায়ে কাউসার, যাতে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় নবীর প্রতি মহব্বতের প্রকাশ স্বরূপ ঘোষণা করেছেন-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

"(হে নবী) আমি তোমাকে কাউসার (অর্থাৎ সীমাহীন নিয়ামত) দান করেছি। অতএব, তুমি কেবলমাত্র তোমার রবের জন্যেই নামাজ পড় এবং তোমার রবের জন্যে কুরবানী কর। তোমার শত্রু পক্ষ হবে শিকড়বিহীন।"

(সূরা আল কাউসার- ১-৩)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় নবী এই সান্ত্বনার বাণীটি কখন পেয়েছেন, কোন অবস্থায় পেয়েছেন তা একটু গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করলে যে কেউ অনুভব করতে সক্ষম হবে।

www.bjilibrary.com

অহি প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মক্কার সর্বস্তরের জনমানুষের কাছে নবী মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বিশ্বস্ত ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওতের ঘোষণা প্রাপ্তি ও তার পরবর্তী দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে তিনি আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নিজের জাতি গোষ্ঠীর লোকদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেন। মুষ্টিমেয় যে সব সাথী-সঙ্গী ঈমানের অধিকারী হওয়ার ফলে তার পাশে দাঁড়ান তারাও তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আবু জেহেল, আবু লাহাবের গোষ্ঠী বিদ্রূপ করে বলা শুরু করে আরে রাখ মুহাম্মাদের (সা.) কথা, তার কোন শিকড় নেই। তাদের ভাষায় আরবি শব্দটি ছিল 'আবতার' শিকড় কাটা বা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। একটি গাছের জড় বা শিকড় কেটে ফেললে যেমন সে গাছটি আর বেশি দিন বাঁচতে পারে না, তেমনি মুহাম্মদ (সা.)-এর জনমানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াকে তারা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই বুঝানোর চেষ্টা করে। এতে অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পুত্র সন্তান ইব্রাহীম ও আব্দুল্লাহর ইন্তেকালের পরে। তারা বলতে শুরু করে আরে একে তো সে জন-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর তার কোন পুত্র সন্তানও নেই। সে মারা যাবার পর তার নাম নেওয়ার মত কেউ তো থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইবনে জারির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মদিনা থেকে একদা এক ইয়াহুদী সরদার কা'ব বিন আশরাফ-মক্কায় এলে তাকে এই বলে জিজ্ঞেস করা হল আচ্ছা দেখ তো এই ছেলেটা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যে আমাদের কওম থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ সে মনে করে যে, সে আমাদের থেকে অনেক ভাল। অথচ আমরা হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে শুরু করে সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকি। এভাবে নির্ভরযোগ্য তাফসির বিশারদগণের মতে মক্কার কুরাইশ সরদারগণ মুহাম্মাদ (সা.)-এর সেই সময়ের অবস্থানটিকে তাদের ভাষায় আবতার হিসেবে বর্ণনা করত। যার অর্থ দাঁড়ায় দুর্বল অসহায়, বন্ধুহীন, নিঃসন্তান যে নাকি তার সমাজ থেকে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় "রাসূল (সা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহর ইন্তেকালের পর আবু জেহেলও এরূপ একটি উক্তিই করেছিল। শামেরা বিন আতিয়া থেকে ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনায় উল্লেখ

www.bjilibrary.com

আছে রাসূল (সা.)-এর এই শোকাহত মুহূর্তে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওকবা বিন আবি মুয়ায়েতও এই ধরনের নীচু মনের পরিচয় দিয়েছিল মনের আনন্দ উল্লাস প্রকাশের মাধ্যমে। হুজুরের (সা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর মুহূর্তে তার আপন চাচা আবু লাহাবও দৌড়ে গিয়ে মুশরিকদের তার ভাষায় এই বলে শুভ সংবাদ! দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ শিকড়বিহীন হয়ে পড়েছে। কারণ তার আর কোন পুত্র সন্তানই থাকল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি যখন আল্লাহর রাসূল এবং তার মুষ্টিমেয় প্রিয় সাথীদের জন্যে আল্লাহর প্রশস্ত জমিনকে চরম সংকীর্ণ করে তুলছিল, ন্যূনতম আশার আলো যখন ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ছোট্ট কয়েকটি বাক্যাংশের মাধ্যমে আল্লাহর নবী এবং সাথীদেরকে যে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে তা সত্যিসত্যিই অতুলনীয়। এটাও একটি অকাট্য দলিল, কুরআন আল্লাহর কিতাব।

প্রশ্ন হলো এত সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী আমানতদার এবং সত্যবাদী মুহাম্মাদ (সা.) কেন হঠাৎ তার আগের অবস্থান থেকে বঞ্চিত হলেন। কি ছিল তার অপরাধ? অপরাধ একটিই তিনি তার কওমকে ডাক দিলেন এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর যিনি সকলের স্রষ্টা। নিজে ঐ এক আল্লাহর বন্দেগী করছেন, তার সাথী-সঙ্গীরাও ঐ এক আল্লাহর বন্দেগী করছেন। ঐ এক আল্লাহর বন্দেগীর সাথে কাউকে তারা শরীক করেন না। এভাবে তাওহীদ গ্রহণের এবং শিরক বর্জনের আহ্বান ছিল তার ও তার সাথীদের অপরাধ। এ কারণে তাদের বিরোধিতা এতটাই অন্ধত্বের শিকার হয় যে তার পুত্র সন্তানের মৃত্যুতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী হিসেবে শোক ও সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে তারা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে এবং এমন এমন মন্তব্য করতে থাকে যা নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মত একজন শরীফ লোকের হৃদয়কে দারুণভাবে আহত করে। যিনি শুধু আপন জনের নয়, অনাত্মীয়দের সাথেও সব সময় সুন্দর আচরণ করেছেন।

এহেন একটি সংগীন মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় নবীর জন্যে এই সংক্ষিপ্ততম সূরার মাধ্যমে এমন একটি শুভ সংবাদ প্রদান করলেন- যা দুনিয়ায় আর কখনো কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি। এবং সেই সাথে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতিপক্ষকেও জানিয়ে দিলেন যে তার বিরোধিতাকারীরাই শিকড়হীন হয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

তীব্র বিরোধিতা

নবুয়্যাতের ঘোষণা ও নীরব দাওয়াতী তৎপরতার এক পর্যায়ে মক্কার কাফের মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকে। যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা-মশকারা, তিরস্কার, গালমন্দের গণ্ডি পেরিয়ে দৈহিক নির্যাতন নিপীড়নে রূপ নেওয়া শুরু করে। বিশেষ করে যে সব গরীব মানুষ ও ক্রীতদাসগণ ইসলাম কবুল করে তাদের উপর চালানো হয় অকথ্য ও অমানবিক জুলুম নির্যাতন। আরবের তপ্ত মরু বালুকায় দিন দুপুরে তাদের শায়িত করে টেনে হিঁচড়ে নাজেহাল করা হয়। তপ্ত বালুর উপর শোয়ায়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়। কর্মজীবী মানুষকে কাজ করানোর পর তাদের পারিশ্রমিক দিতে শর্ত করা হয় ইসলাম ত্যাগ করার। এভাবে রাসূলের দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করত তাদেরকেও হতে হয় নানা হয়রানির শিকার। সম্মানী লোকদের করা হয় অপমান অপদস্ত। যা রাসূলের সাথী সঙ্গীদের জীবনকে করে তোলে অতিষ্ঠ। এই সময়ের পরিস্থিতির বর্ণনায় হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন- একদিন রাসূল (সা.) কাবা বায়তুল্লাহর ছায়াতলে উপস্থিত হলে আমি হুজুরের (সা.) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম "হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এখন তো জুলুম নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি কি আল্লাহর কাছে দো'য়া করতে পারেন না?" একথা শোনামাত্র আল্লাহর রাসূলের (সা.) চেহারা মোবারকে অসন্তোষের ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের আগের ঈমানদারদের উপর এর চেয়ে আরো অনেক বেশি জুলুম অত্যাচার হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের শরীরের হাড় থেকে গোশত আলাদা করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর করাত দিয়ে দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তারপরও তারা এই সত্য দীন ত্যাগ করেনি। দৃঢ় আস্থার সাথে বিশ্বাস রাখ- আল্লাহ আমাদের এই কাজকে একদিন অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সফল করেই ছাড়বেন। এমনকি এরূপ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে একজন মানুষ সানা থেকে হাজরা মওত পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় সফর করতে পারবে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর ভয়-ভীতি থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"

হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত

এহেন পরিস্থিতি যখন মানবিক দৃষ্টিতে সহ্যের সীমা অতিক্রম করার উপক্রম হল, তখন রাসূল (সা.) তার সাথী সঙ্গীদেরকে আবিসিনিয়ায়

www.bjilibrary.com

হিজরতের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা যদি মক্কা ভূমি ত্যাগ করে হাবশায় চলে যেতে পার, সেখানে এমন একজন বাদশাহ্‌ আছেন যার ওখানে কারো উপর জুলুম করতে দেওয়া হয় না। ওটা একটা ভাল দেশ। তোমাদের বর্তমান বিপদ মুছিবত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানেই অবস্থান করবে।"

রাসূলের এই নির্দেশক্রমে প্রথমে এগার জন পুরুষ ও চার জন মহিলা হাবশায় রওয়ানা হয়ে যান। পরবর্তী পর্যায়ে আরো কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ হাবশা বা আবিসিনিয়ায় পৌঁছে যায় এবং একত্রিত হয়। তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় একশত একজন (১০১)। এর মধ্যে কোরায়েশ গোত্রের বিভিন্ন শাখার ৯৪ জন এবং কোরায়েশ গোত্রের বাইরের সাতজন। রাসূল (সা.)-এর সাথে যারা রয়ে গেলেন তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট চল্লিশজন। মজলুম সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) এই হিজরতের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হল সাংঘাতিক। কোরায়েশ গোত্রের ছোট বড় প্রায় পরিবারেরই কেউ না কেউ শরীক হয় এই হিজরতে। ফলে নাড়ীর টান অনুভূত হল তাদের সকলের মধ্যে। কারণ কারো ছেলে কারো ভাই ভাতিজা কারও বোন কারো জামাই কারো মেয়ে শামিল ছিল ঐ মোহাজেরদের মধ্যে। কোরায়েশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও ইসলামের কট্টর দুশমনের নিকট আত্মীয় কলিজার টুকরো সমতুল্য নিকট আত্মীয় দীনের খাতিরে এভাবে বাড়িঘর ত্যাগ করার বিরূপ প্রভাব পড়ে সকলের পরিবারেই। এর ফলে কারো বিরোধিতা আরো তীব্র হল আবার কারো মনে ইসলামের প্রতি সহানুভূতি হল এমনকি কেউ কেউ ইসলাম কবুলও করল।

হযরত ওমর (রা.) তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। বরং ইসলামের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কট্টরতম। তিনিও এই ঘটনায় ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হন। তার এক নিকট আত্মীয়া হযরত লায়লা বিনতে হাছমা বর্ণনা করেছেন, "আমি হিজরতের জন্যে সামানপত্র প্রস্তুত করছি। আমার স্বামী এসময় বাইরে ছিলেন। ইত্যবসরে ওমর আসলেন এবং আমার প্রস্তুতি নিতে দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন আবদুল্লার মা- সত্যি চলে যাচ্ছ।"? আমি বললাম হ্যাঁ যাচ্ছি। খোদার কসম তোমরা আমাদের উপর সাংঘাতিক নিপীড়ন চালিয়েছ।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর প্রশস্ত জমিন পড়ে আছে আমরা এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। একথা শোনামাত্র ওমরের চেহারায় এমন নমনীয়ভাব ফুটে উঠল যা কোন দিনও দেখিনি। এরপর একথা বলে বেড়িয়ে গেলেন 'যাও আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

হিজরতে হাবশার এই ঘটনার পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে পরামর্শ করে আবু জেহেলের ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া এবং আমর ইবনুল আসকে হাবশায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাদের দুজনকে পাঠানো হল প্রচুর উপঢৌকন সহকারে যাতে করে হাবশার বাদশাহকে রাজী করিয়ে ঐ সকল মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে আনা যায়। এই হিজরতে শরীক ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমাও। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া ও আমর ইবনুল আসের এই কূটনৈতিক মিশনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কুরাইশদের এই দুইজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ দূত হিসেবে আমাদের পিছে পিছে হাবশায় পৌঁছে। প্রথমে তারা নাজ্জাশী বাদশাহর সভাসদদের মধ্যে ব্যাপক উপহার সামগ্রী বিতরণ করে তাদের মন জয় করে নেয় এবং মুহাজিরদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাদশাহকে রাজী করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। অতঃপর তারা বাদশাহ নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রী তার দরবারে পেশ করে। এরপর তারা বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলে, আমাদের শহরের কিছু অজ্ঞ অর্বাচীন ছেলে ছোকরা আপনার এখানে পালিয়ে এসেছে। আমাদের কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্যে আমাদেরকে পাঠিয়েছে। এই লোকেরা আমাদের দীন ত্যাগ করেছে, আপনার দীনেও প্রবেশ করেনি। বরং তারা এক অদ্ভুত দীন আবিষ্কার করেছে।" তাদের কথা শেষ হতে না হতেই সভাসদগণ বলতে শুরু করল "এমন লোকদেরকে অবশ্য অবশ্যই ফেরত পাঠানো উচিৎ। তাদের কওমের লোকেরাই ভাল জানে তাদের মধ্যে কি সব দোষত্রুটি আছে। এদের আশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু নাজ্জাশী রাগত:স্বরে বললেন, "এভাবে তো আমি তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারি না। যারা অন্য দেশের প্রতি আস্থা না এনে আমার দেশের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের এই আস্থাকে অবমূল্যায়ন করতে পারি না। আমি তাদেরকে ডেকে এনে ব্যাপারটি যাচাই করে দেখি।

www.bjilibrary.com

এরা তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, তা কতটা যথার্থ। সুতরাং বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূলের সাহাবায়ে কেরামদের তার দরবারে ডেকে পাঠালেন।

বাদশাহ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে পয়গাম পাওয়ার পর রাসূলের (সা.) মুহাজের সাহাবাগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন। বাদশাহর দরবারে তারা কি বক্তব্য রাখবেন সবাই মিলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা ঠিক করলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন কোন রাখঢাক না করে তা হুবহু পেশ করবেন। তাতে নাজ্জাশী আমাদেরকে এখানে রাখলে রাখবে, না হয় বের করে দেবে। বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে পৌছতেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন এটা তোমরা কি করেছ তোমাদের দীনও ছেড়ে দিয়েছ আবার আমার দীনেও প্রবেশ করো নাই? আর না দুনিয়ায় অন্য কোন দীন কবুল করেছ? এরপর মুহাজেরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব একটি জোরালো বক্তব্য দিলেন, যার মাধ্যমে তিনি জাহেলিয়াতের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরলেন। অতঃপর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির ও তার প্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষার উপর আলোকপাত করলেন। সেই সাথে রাসূলের অনুসারীদের উপর কুরাইশদের জুলুম অত্যাচার এর বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এবং এই বলে বক্তব্য শেষ করলেন যে, আমরা অন্য কোন দেশে না গিয়ে আপনার এখানে এসেছি এই আশায় যে, এখানে আমাদের উপর জুলুম হবে না। হযরত জাফর ইবনে আবি তালিবের বক্তব্য শেষ হবার পর বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, আমাকে ঐ বাণী থেকে কিছু শোনাও যেটা সম্পর্কে তোমরা বলে থাকো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর উপর নাজিল হয়েছে। এর প্রতিউত্তরে হযরত জাফর (রা.) সূরায়ে মরিয়ম থেকে প্রাথমিক অংশ তেলাওয়াত করে শোনালেন যাতে হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ ছিল। নাজ্জাশী এটা শুনছিলেন এবং কাঁদছিলেন এমন কি চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গিয়েছিল। হযরত জাফরের তেলাওয়াত শেষ হতেই তিনি বললেন, "সন্দেহ নেই এই কালাম আর যা কিছু হযরত ঈসা (আ.) এর উপর নাজিল হয়েছিল একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে ওদের কাছে ছেড়ে দিব না।"

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় দিন আবার আমর ইবনুল আস বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে বলল, ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করুন ঈসা (আ.) সম্পর্কে ওদের ধারণা কী? তারা কিন্তু এ সম্পর্কে একটি ভিন্নধর্মী মারাত্মক কথা বলে থাকে। নাজ্জাশী আবার মুহাজেরদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা আমর ইবনুল আসের এই কূটনৈতিক চাল সম্পর্কে উতোমধ্যে আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারেও তারা আগের মতই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তারা এ ক্ষেত্রেও কোন রাখঢাক করবেন না। আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাকে বিনাদ্বিধায় অকপটে তুলে ধরবেন। অতএব তারা যখন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে গেলেন এবং আমর ইবনুল আসের পেশকৃত প্রশ্নটি বাদশাহ্ নাজ্জাশী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত জাফর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বিনাদ্বিধায় ঘোষণা করলেন "ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং তাঁরই পক্ষ থেকে একটি রূহ্ এবং একটি বাণী। যা কুমারী মরিয়মকে প্রদান করেছেন।" নাজ্জাশী এটা শোনা মাত্র হাতে একটি তৃণখণ্ড নিলেন এবং ঘোষণা করলেন, খোদার কসম! তুমি ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা কিছু বলেছ তিনি তা থেকে এই তৃণখণ্ড তুল্যও অতিরিক্ত কিছু নন। এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সকল উপহার উপঢৌকন ফেরত দিয়ে বললেন আমি ঘুষ নেই না। এবং সেই সাথে মুহাজিরদের বললেন তোমরা এখানে পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে থেকে যাও।"

আবিসিনিয়ার হিজরতের সময়কাল ছিল পঞ্চম নবুবী বছরের মধ্যবর্তী সময়। রাসূলের মক্কার জীবন সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা চার অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সে হিসেবে এটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ বছরের প্রায় শেষের দিকের ঘটনা। মূলত সূরায়ে আল মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াতের মধ্যে 'কুম ফা আনজিরের' সফল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সাথী সঙ্গীগণ যে নীরব দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন তারই প্রতিক্রিয়ায় ও পটভূমিতে সংঘটিত হয় এই ঐতিহাসিক হিজরতের ঘটনা। এই হিজরতের পটভূমির আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের জুলুম নির্যাতন পর্যায়ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাদের মনের কষ্ট ও অস্থিরতার কথা ব্যক্ত করলে আল্লাহর

www.bjilibrary.com

রাসূল তাদেরকে অতীতের নবী-রাসূলদের সাথী সঙ্গীদের ধৈর্য ও ঈমানী দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে তাদেরকেও ছবরের এবং ইস্তেকামাতের নির্দেশ দেন এ জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল, চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার সাথীদেরকে আল্লাহর রাসূল সান্ত্বনা বাণী শুনিয়েছেন। ভবিষ্যতের সোনালী সাফল্যের শুভ সংবাদ ও পূর্বাভাস দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার মত কোন নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে তো দেনই নাই বরং পরোক্ষভাবে বা আকারে ইংগিতেও কিছু বলেননি। আবার সত্য ছেড়ে দেবার কথাও বলেননি। বরং যে দীন তারা গ্রহণ করেছে তার উপর অটল অবিচল থাকার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে হিজরতের অনুমতি এমনকি নির্দেশ দিয়েছেন।

এই অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাত এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর মানুষের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, কীভাবে তাদের মন মগজ ও চরিত্র গড়ে উঠেছিল তার একটি জীবন্ত নমুনা আমরা দেখতে পাই আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী আল্লাহর রাসূলের এই প্রিয় সাহাবীদের মধ্যে। তারা বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে কথা বলতে গিয়ে যেমন সততা ও স্বচ্ছতার এবং সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি পরিচয় দিয়েছেন দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার। এত অল্প দিনের শিক্ষা নিয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সার্থকভাবে। জাহেলি যুগের সমাজ চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আল্লাহর রাসূলের শিক্ষায় তাদের জীবনে যে অর্থবহ ও বাস্তব সম্মত পরিবর্তন এসেছে তাও উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে বাদশাহ নাজ্জাশীর অন্তরে। আমর ইবনুল আসের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির কুটনৈতিক চালের মুকাবিলায় হযরত ঈসা (আ.)-এর নিখুঁত পরিচয় যেভাবে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব তুলে ধরেন তা একদিকে যেমন তার বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে, তেমনি অপর দিকে খ্রিষ্টান জগতের কাছে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আজকের এই আধুনিক যুগেও এটি একটি রোল মডেলের ভূমিকা রাখতে পারে। দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে যে হিকমত অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তার সফল বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই এখানে।

www.bjilibrary.com

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীদের এই অনুসরণীয় সুন্দর ভূমিকার পাশাপাশি আমরা তার প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ও চতুর্মুখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা পারঙ্গমতাকেও উপেক্ষা করতে পারি না বা ছোট করে দেখতে পারি না। তাদের অত্যাচারে, জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল, তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে তাদের জন্যে বুমেরাং হতে পারে এটা উপলব্ধি করেই তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে ঐ সব ঈমানদার মুহাজেরদেরকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে তাদের দূরদর্শিতার এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আজকের প্রতিপক্ষের তুলনায় তারা মোটেই কম যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। তারা ঈসায়ী আদর্শে বিশ্বাসী বাদশাহকে ঈমানদার মুহাজেরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে যে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় তাতেও যথেষ্ট কূটনৈতিক দক্ষতা যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাদশাহকে রাজী করানোর জন্যে তার সভাসদ ও পরিষদকে বশে আনার ক্ষেত্রে তাদের কৌশলী ভূমিকাও লক্ষণীয়। বাদশাহর দরবারে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুসলমানদের সাফল্যের পর আবার বাদশাহর কাছে ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করার জন্যে নাজ্জাশীকে পুনরায় রাজী করানোর ক্ষেত্রে তাদের কৌশলটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের দিনে একই কায়দায় বিশ্বের পরাশক্তিকে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে, তাদেরকে ইসলামী শক্তি সম্পর্কে বৈরী করে তোলার জন্যে আমাদের দেশীয় একটি মহলের ভূমিকা কিন্তু হুবহু এই রূপই দেখা যায়। পার্থক্য এতটুকু যে তখনকার যুগে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল না। কিন্তু লবিংয়ের ধরন প্রকৃতি প্রায় এক এবং অভিন্ন।

এহেন চরম প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই, কুরআন যেমন কোন প্রকারের উগ্রতাকে বা প্রতিশোধ, প্রতিহিংসাকে অবলম্বন করার অনুমতি দেয়নি, তেমনি আবার ইসলামের সঠিক দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের গোঁজামিলের বা আপোষকামিতাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। যারা দাওয়াতের বিরোধিতা করছে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যুক্তির মাধ্যমে তাদের পথকে ভুল প্রমাণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ভুল পথ না ছাড়ার পরিণাম দুনিয়ায় কী আর আখেরাতে কী তাও যুক্তির ভিত্তিতে

www.bjilibrary.com

বলা হয়েছে। অতীতের নবী-রাসূলদের ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে, এটা বুঝানোর জন্যে যে, তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান কারীগণ যেমন পরিণামে ব্যর্থ হয়েছে, অনুরূপভাবে এরাও বিরোধিতা করে রাসূলের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সাময়িকভাবে দুনিয়ায় কিছু দিন বাড়াবাড়ি করতে পারলেও আখেরাতের মহাশাস্তি তারা কিছুতেই এড়াতে পারবে না।

রাসূলের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

উপরের আলোচনায় অতি সংক্ষেপে হলেও আমরা যে কথাটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, তা হল মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কিছু মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী থাকায়, ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসাবে তাদের ভূমিকা ছিল পরিকল্পিত এবং চাতুর্যপূর্ণ। রাসূলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা হতেই তারা অনুমান করে ফেলে, আসছে হজ্জের মওসুমে মুহাম্মদ (সা.) আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজীদের মধ্যে কুরআন প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কুরআনের বাণীর মধ্যে যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, এটা তাদের অজানা ছিল না। বরং এ ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়েই তারা তাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। উক্ত সম্মেলনে হজ্জের সময় বিভিন্ন দিক থেকে আগত হাজীদের মাঝে যাতে মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ না পান সেজন্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সে সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক প্রপাগান্ডা শুরু করতে হবে যাতে তার কথা কেউ শুনতে না পায়।

নীতিগতভাবে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে আসার পর ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে একেকজন একেকরকম কথা বল তোমাদের সবার অবস্থান ও মর্যাদা খাট হয়ে যাবে। অতএব আমাদের ঐক্যমতে আসতে হবে যেন সবাই মিলে এককথা বলতে পারি। তাই এবার সবাই পরামর্শ দাও তার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা জোরদার করতে হলে কোন কথাটি বেশি কার্যকর হতে পারে।

www.bjilibrary.com

এই সময়ে কিছু লোক বলে উঠলো মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা গণক হিসেবে প্রচার করতে পারি। এ প্রস্তাব প্রসঙ্গে অলিদ ইবনে মুগিরা বলল, না খোদার কসম তাকে গণক হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। গণকদেরকে তো আমরা চিনি। তাদের তো আমরা দেখেছি, তারা যে সব আচরণ করে, যে ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা বলে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত কুরআনের সাথে দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। কিছু লোক বলল তাকে আমরা পাগল সাব্যস্ত করতে পারি। অলিদ বলল না, আমরা তাকে পাগলও বলতে পারি না। পাগল কেমন উল্‌টা পালটা আচরণ করে, বেসামাল উক্তি করে তা তো মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী মানুষের প্রলাপ বাক্য তা কাউকেও বিশ্বাস করানো যাবে না। কোন মানসিক রুগীর পক্ষেই এধরনের কথা বলা আদৌ সম্ভব হতে পারে না। কেউ প্রস্তাব করল, তাকে কবি বলা যেতে পারে। এর উত্তরে অলিদ বলল, না তাকে কবিও বলা যায় না। কবিতার সকল ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে আমার জানা আছে। মুহাম্মদ (সা.) যে কুরআনের বাণী উপস্থাপন করছে তাকে তো কবিতার কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। এরপরে কেউ বলল তাকে যাদুকর বলা যেতে পারে। অলিদ এ ব্যাপারটিও নাকচ করে দিল এই বলে যে না, তাকে তো যাদুকর রূপেও চালিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যাদুকরদেরকে আমরা চিনি, তারা যাদুগিরি করতে গিয়ে যেসব কাজ কারবার করে থাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে তার কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং মানুষকে এটাও বিশ্বাস করানো যাবে না। সুতরাং এ পর্যন্ত যেসব প্রস্তাব করা হল তার মধ্য থেকে যেটাই প্রচার কর না কেন মানুষ বিশ্বাস তো করবেই না, উল্টো এটা ভাবতে বাধ্য হবে যে, তোমরা একটি লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডায় লিপ্ত হয়েছ।

খোদার কসম কুরআনের বাণী বড়ই আকর্ষণীয় এর শিকড় অনেক গভীরে প্রতিষ্ঠিত। আর শাখা-প্রশাখা ফুলে-ফলে সুশোভিত। অলিদের এই উক্তি শুনে আবু জাহেল বলে উঠল, অলিদের তো মাথা বিগড়ে গেছে। এরপর তাকে লক্ষ্য করে বলল- অলিদ, মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারে প্রপাগান্ডা স্বরূপ চাউর করার মত কোন কথা বাজারে না ছাড়া পর্যন্ত তোমার কওম তোমার নেতৃত্ব মেনে নেবে না। তখন অলিদ বলল, আচ্ছা আমাকে একটু চিন্তা করার সময় দাও, অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর বলল,

www.bjilibrary.com

আরবদের কাছে মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারে যে কথাটি তোমরা প্রচার করতে পার, তাহল এই, লোকটি যাদুকর। এ লোকটি এমন এক ধরনের বাণী প্রচার করছে, যার ফলে মানুষ তাদের বাপ, ভাই, বিবি, বাচ্চা এমনকি গোটা খান্দান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। অলিদের এই প্রস্তাব সবাই মেনে নিল। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পিতভাবে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে প্রচার অভিযানে নেমে পড়ল। তারা আগত হাজীদেরকে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগল, এখানে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি বড় রকমের যাদুকর। তার যাদুর প্রভাবে খান্দানের লোকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে। তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। খবরদার তার কথা তোমরা কেউ শুনবে না। কিন্তু কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এই পরিকল্পিত প্রপাগাণ্ডা অভিযানও বুমেরাং হল। তাদের মুখে মুখে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম গোটা আরব বিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা যে বিষয়টি শিক্ষণীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তা হল; ইসলামের প্রতিপক্ষীয় শক্তির কৌশলের প্রধান দিক সব সময়েই ছিল অপপ্রচার এবং মিথ্যা প্রপাগান্ডা যা আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে নতুন মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি আছে। আপন মহিমায় মিথ্যা প্রপাগান্ডার সকল ধুম্রজাল ছিন্ন করে সত্য তার স্থান করে নিতে সক্ষম। সেই সাথে খোদায়ী বিধান হল-

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا -

"তারা পরিকল্পনা আঁটে তাদের সকল সাধ্য সামর্থ্য উজাড় করে দিয়ে। তার মোকাবিলায় আল্লাহর একটা পরিকল্পনা থাকে তার শান অনুযায়ী।"

(সূরা আন নামল- ৫০)

এই কথাটি অতীতে যেমন সত্য প্রমাণিত হয়েছে তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যেও তা সত্য প্রমাণিত হবে ইনশাল্লাহ।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে আর একটি সত্য বেরিয়ে আসে তা হল, এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাসূলের দাওয়াতকে অসত্য মনে করে প্রত্যাখ্যান করে নাই। বরং অনেকেই দাওয়াত কবুল

www.bjilibrary.com

করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন অলিদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, তার দিল সাক্ষ্য দিয়েছে, নবী মুহাম্মদ (সা.) গণক নয়, কবি নয়, পাগল নয়, যাদুকরও নয়। কিন্তু তার নেতৃত্ব রক্ষার খাতিরেই তাকে অবশেষে তার বিবেকের বিরুদ্ধে বলতে হল, মুহাম্মদকে (সা.) তোমরা অরবদের কাছে যাদুকর হিসেবে প্রচার করতে পার।" আজকের দিনেও আমরা একই ধারা দেখতে পাই ইসলামের বিপক্ষের শক্তির মধ্যে।

অতি প্রগতিশীল রাজনীতিকদের অনেকেই তাদের 'প্রগতিশীল সুশীল সমাজ' এর মন রক্ষার জন্যে, কেউ আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের আশীর্বাদ লাভের জন্যে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকেন। আবার প্রচলিত দীনি মহলের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থান ঠিক রাখার স্বার্থে সত্য গোপন বা কিতমানে শাহাদাতের ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইতিহাস আসলেই পুনরাবৃত্ত হয়। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা হল, ইতিহাস থেকে কেউই শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না।

কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এক: ধর্মহীন রাজনৈতিক শক্তি। দুই: অসাধু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তিন: ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের বিরোধিতায় এই তিন শ্রেণীকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। শেষ নবীর দাওয়াতের বিরোধিতায়ও ঐ তিনটি শ্রেণীকেই সক্রিয় ও মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায়। আজকের বিশ্বেও বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতার মূল চালিকা শক্তি এরাই। এদের বিরোধিতা যেমন আন্দোলনের পক্ষকে বাধাগ্রস্ত করে, নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তেমনি আবার এদের বাধা প্রতিবন্ধকতাই প্রমাণ করে ইসলামী আন্দোলন সঠিক ধারায় থাকার বিষয়টি। অপর দিকে অপেক্ষাকৃত গরিব শ্রেণীর লোকেরাই নবী-রাসূলদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে শরীক হয়েছে। শেষ নবীর দাওয়াত কবুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর অনুসারী হিসেবে আজকের দিনে যারা দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, দীন কায়েমের আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন, তাদের সাথেও সাধারণতঃ সমাজের গরিব শ্রেণীই শরীক হচ্ছে। এটাই ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন ইতিহাস ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য।

www.bjilibrary.com

আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্যে প্রভাবশালী লোকদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আল্লাহর শেষ নবীসহ সকল নবী-রাসূলগণই সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের কাছে দাওয়াত পেশ করেছেন। এই উঁচুস্তরের লোকদের মধ্য থেকে যারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকতে সক্ষম হয়েছেন যারা অনন্ত মৌলিক মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন তারা অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাওয়াত কবুল করেছেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা.) ও উসমান (রা.)। তবে তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম। শেষ নবী দুই ওমরের এক ওমরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি যোগানোর জন্যে দোয়াও করেছেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের তৌফিক দেওয়ায় সত্যি সত্যি ঈমানদারদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে মজবুত হয়েছে। তবে দায়ীকে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকার নির্দেশিকা দিয়েছেন যাতে করে প্রভাবশালী লোকদেরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে ঈমান গ্রহণকারীদের অবমূল্যায়ন করা না হয়। সূরায়ে আবাসার প্রথম থেকে ষোল নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তার প্রিয় নবীর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক সাবধান করেছেন। সূরায়ে কাহাফের ২৭ থেকে ৩১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ সংক্রান্ত আয়াতে ব্যাপক সুন্দর ও বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনা এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সূরায়ে আবাসার ১ থেকে নিয়ে ১৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সূরায়ে কাহাফের ২৭ থেকে ৩১ নম্বর আয়াতের মধ্যে সে বিষয়টি তো আছেই। তার অতিরিক্ত চরম বিরোধিতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে আপোষের সুযোগ নেই, রেখে ঢেকে কথা বলার সুযোগ নেই, কে ঈমান আনল আর কে ঈমান আনল না এ ব্যাপারে কোন পরোয়া করার দরকার নেই, হক কথা সোজা সাপটা বলে দিতে হবে। রাসূলের আন্দোলনের এক পর্যায়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে দুই ধরনের কথাবার্তা আসতে থাকে নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে। এর একটি ছিল- এত জেদ করার কি আছে, এতটা আপোষহীন হওয়ার কি আছে, মুহাম্মদ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম বিশ্বাসের কিছু কিছু মেনে নিতে পার না? সেই আলোকে তোমার আকিদা বিশ্বাসে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করতে পার না? যার উদ্ধৃতি আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ইউনুসের ১৫ নম্বর আয়াতে এভাবে দিয়েছেন-

www.bjilibrary.com

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ

"যখন আমার আয়াত তাদেরকে স্পষ্টভাবে শুনানো হয়, তখন আমার কাছে জবাবদিহির জন্যে হাজির হতে হবে এই বিশ্বাস যাদের নেই, তারা বলে, এই কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে এসো অথবা এটাকেই একটু সংশোধন বা রদবদল করে নাও।" (সূরা ইউনুস- ১৫)

তাদের অপর কথাটি ছিল, হে মুহাম্মদ (সা.) আমরা আপনার কাছে কি করে আসব। আমরা আরবের শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত গোত্রের মানুষ হয়ে ঐসব নীচু শ্রেণীর লোকদের সাথে তো আপনার পাশে বসতে পারি না। মূলত তাদের এই দুইটি অন্যায় আবদারের জবাব দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সূরায়ে কাহাফের এই ক'টি আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা-

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا - وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا - وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا - أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا -

www.bjilibrary.com

"হে নবী, তোমার রবের কিতাবের মধ্যে যা কিছু তোমার উপর নাজিল করা হয়েছে তা হুবহু মানুষের কাছে পৌছিয়ে দাও। আল্লাহর কথায় কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনের এখতিয়ার কারো নেই। (যদি কারো মন রক্ষা করতে গিয়ে এমনটি করতে চাও তাহলে মনে রেখ) এ থেকে বাঁচার জন্যে কোন আশ্রয় স্থল খুঁজে পাবে না। আর তাদের সাহচর্যের জন্যে নিজের মনকে পরিতৃপ্ত রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকে তাঁর সন্তোষ লাভের আশায়। তাদের থেকে কখনও দৃষ্টি অন্যত্র ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি দুনিয়ায় চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য কামনা কর? যাদের দিল আমার স্মরণ থেকে গাফেল এবং উদাসীন। যারা চরমপন্থা ও সীমালংঘনকারী এবং প্রবৃত্তির অনুসারী তাদের কথামত চলতে পারবে না। স্পষ্ট বলে দাও এই সত্য এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এখন যার মন চায় মেনে নিক আর যার মন না চায়, সে না মানুক। আমি এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী জালেমদের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামের আগুন তৈরি করে রেখেছি। যার আওতায় তারা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। সেখানে পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলে তাদের এমন পানি দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে যা হবে বিগলিত ধাতব পদার্থের মত যার ফলে ঝলসে যাবে তাদের মুখমণ্ডলী। কতই না নিকৃষ্ট হবে সেই পানীয়, কতইনা নিকৃষ্ট হবে সেই বাসস্থান। যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, নিশ্চিত হও আমি নেক লোকদের প্রতিদান ও পুরস্কার নষ্ট হতে দিব না। তাদের জন্যে চিরবসন্ত বিরাজমান জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝরণা ধারা, যেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কণ অর্থাৎ শাহী পোষাকে সজ্জিত করা হবে। সূক্ষ্ম ও গাঢ় সবুজ রেশমী পোশাক তাদেরকে পরানো হবে। এবং সুউচ্চ মসনদে তারা হেলান দিয়ে বসবে। আর এটা হবে তাদের জন্যে উত্তম কর্মফল ও উন্নতমানের অবস্থান।" (সূরা আল কাহাফ-২৭-৩১)

এখানে একদিকে কারো চাপের মুখে অথবা কাউকে খুশি করার জন্যে দীনের দাওয়াত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন কোন প্রকারের কাটছাট রাখ-ঢাকের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তেমনি গরীব সহজ সরল ঈমানদারদের চেয়ে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিতেও বারণ করা হয়েছে। যে সব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রাসূলের গরিব অনুসারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করত - তাদেরকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, গরিব বলে

www.bjilibrary.com

আজ যাদেরকে তারা অবহেলা আর অবজ্ঞা করছে - আখেরাতে আল্লাহর কাছে তারা পাবে রাজা বাদশাহর মতো মর্যাদা। আর যারা আজ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে গর্ব অহঙ্কার করছে তাদের পরিণতি হবে চরম ও ভয়াবহ। দাওয়াতে দীনের কাজ রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে চলছে। দাওয়াত কবুলকারীদের সংখ্যা ব্যাপক না হলেও কুরাইশ গোত্রের প্রায় সব পরিবারেরই কেউ না কেউ ঈমানের ঘোষণা দিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অলিদের নেতৃত্বে শলা-পরামর্শ করে কুরআনের দাওয়াত শোনার পক্ষে বাধা সৃষ্টির পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতোমধ্যে হযরত হামজার মত প্রভাবশালী কুরাইশ নেতা ইসলাম কবুল করায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ ও হতাশা আরো বেড়ে যায়। তাই আবার তারা মসজিদুল হারামে, কাবা বায়তুল্লাহর সন্নিকটে সম্মিলিত হয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে। মসজিদুল হারামের অপর প্রান্তে নবী মুহাম্মদও (সা.) অবস্থান করছিলেন। এই সময় আবু সুফিয়ানের শ্বশুর ওতবা ইবনে রাবিয়া কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা পছন্দ করলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কথা বলে দেখি, কিছু প্রস্তাব তার বিবেচনার জন্যে রেখে দেখি। হতে পারে যে তিনি আমাদের কিছু কথা গ্রহণ করবেন, আমরাও তার কিছু কথা গ্রহণ করব। এভাবে তিনি আমাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকবেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সবাই ওতবার প্রস্তাব সমর্থন করল।

ওতবা সাথে সাথেই ওঠে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে বসে পড়ল। রাসূল (সা.) তার দিকে মনোযোগী হতেই সে বলতে শুরু করল ভাতিজা, আরব জাতির কাছে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে তোমার অবস্থা তো তুমি ভাল করেই জান। কিন্তু তুমি তোমার জাতির জন্যে একটি বড় রকমের বিপদ নিয়ে এসেছ। তুমি সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ। গোটা জাতিকে তুমি বোকা বানিয়ে ছাড়ছ। জাতির দীন ধর্ম ও তাদের মাবুদদের তুমি নিন্দা চর্চা করছো। তুমি এমন এমন সব কথা বলতে শুরু করেছ, যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের সবার বাপ-দাদা ছিল কাফের। এখন আমার কথা শোন, আমি তোমার সামনে বিবেচনার জন্যে কিছু প্রস্তাব রাখছি। এ সম্পর্কে একটু চিন্তাভাবনা করে দেখ। আমি আশা করি তুমি এর কোন একটি কবুল করবে। রাসূল (সা.) বললেন আবু অলিদ বলুন, আমি শুনব, অতঃপর

www.bjilibrary.com

ওতবা কথা শুরু করল এবং বলল ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছ, এর মাধ্যমে যদি মাল সম্পদ অর্জন তোমার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এত মাল সম্পদ দিতে রাজী আছি যাতে করে তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যেতে পার। যদি এর মাধ্যমে নিজের জন্যে বড় কোন সম্মানের আসন চাও, তাহলে সবাই মিলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিতে রাজী আছি। তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিব না। যদি রাজত্ব চাও, তোমাকে আমরা বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী। যদি তোমার কাছে কোন জিন এসে থাকে যা তাড়ানোর শক্তি তোমার নেই, তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় চিকিৎসক এনে আমাদের খরচেই তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। ওতবা এই কথাগুলো বলছিল আর রাসূল (সা.) নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন।

এরপর তিনি ওতবাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কথা কি শেষ? ওতবা বলল হাঁ, এরপর রাসূল (সা.) বললেন, আচ্ছা, তবে এখন আমার কথা শুনুন! এর পর রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরায়ে হামীম আস-সাজদাহ তেলাওয়াত করা শুরু করলেন। ওতবা তার দুটি হাত পেছনে মাটিতে রেখে মনোযোগের সাথে শুনতে লাগল। রাসূল (সা.) এই সূরার ২৮ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত শেষে (সেজদার আয়াত বিধায়) সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করলেন। অতঃপর মাথা তুলে উঠে বসলেন এবং ওতবাকে লক্ষ্য করে বললেন আবুল অলিদ, আমার কথা কি শুনেছেন। এবার আপনি আপনার পথ দেখতে পারেন। ওতবা রাসূলের বক্তব্যের পর ওঠে দাঁড়াল এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। দূর থেকে নেতৃবৃন্দ ওতবার চেহারা দেখে মন্তব্য করতে লাগল খোদার কসম ওতবার চেহারা তো বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে ওখানে গিয়েছে এটা আর সে চেহারা নয়। ওতবা এসে বসতেই তারা জিজ্ঞেস করল কি শুনে এলে? ওতবা বলল, "খোদার কসম আমি যে কালাম শুনে এলাম তা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। খোদার কসম এটা কবিতা নয়, যাদু নয়, কোন গণকের কথাও নয়।

www.bjilibrary.com

"হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, তোমরা আমার কথা শোন, মুহাম্মদ (সা.) কে তার মত চলতে দাও। আমি মনে করি কুরআনের এই বাণী একদিন প্রতিষ্ঠা পাবেই। ধরে নাও যদি আরব জাতি তার উপর বিজয় লাভ করে তাহলে তোমাদের ভাইয়ের ওপর আঘাত হানা থেকে তোমরা বেঁচে গেলে, অন্যরাই তাকে শায়েস্তা করবে। কিন্তু যদি সে আরবের উপর বিজয় লাভে সক্ষম হয়, তাহলে তো তার বাদশাহী হবে তোমাদেরই বাদশাহী। আর তার মান সম্মান হবে তোমাদেরই মান-মর্যাদা। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার এই কথা শুনতেই বলে উঠল অলিদের পিতা মুহাম্মাদের যাদু তোমার উপরও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ওতবা বলল, আমার অভিমত আমি তোমাদের কাছে পেশ করলাম এবার তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, তাই করতে পার।" এখানেও লক্ষণীয় কুরাইশদের বরেণ্য নেতা আবু অলিদ ওতবার বিবেক সাক্ষ্য দিয়েছে মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী আর তিনি যে বাণী প্রচার করছেন তা মানুষের কথা নয়, আল্লাহর কিতাব। এরপরও নেতৃত্ব রক্ষার জন্যে বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে পারল না।

www.bjilibrary.com

(৩)

সন্ত্রাস ও বিরোধিতা মোকাবেলার কৌশল

ইসলামের দাওয়াত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপনের ইতিবাচক প্রভাব দেখে প্রমাদ গুণতে থাকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। এ প্রভাব ঠেকাতে তারা সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা ছিল জনগণের কাছে ইসলামের আওয়াজ তথা কুরআনের বাণী পৌঁছাতে না দেওয়া। এ জন্যে একদিকে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা ও প্রপাগাণ্ডা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে থাকে। সেই সাথে কুরআনের আওয়াজ যাতে মানুষের কানে পৌঁছার কোন সুযোগ না হয়, এ জন্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের অনুসারী অনুগামীদেরকে গণ্ডগোল সৃষ্টির নির্দেশ প্রদান করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের এই ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী ও স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের একটি বর্ণনা দিয়েছেন সূরায়ে হা-মীম আস-সাজদাহর মধ্যে। সেই সাথে এ কর্মকাণ্ডের যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, আর যারা নেতৃত্বের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছে, উভয় পক্ষকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন, কুরআনের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এ সব জঘন্য কর্মকাণ্ডের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ - فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ - ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ-

www.bjilibrary.com

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ -

"সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরগণ বলে, তোমরা এই কুরআন কখনও শুন না। যখন কোথাও এই কুরআন শুনানো হয়, তখন সেখানে বাধা সৃষ্টি কর, গোলমাল সৃষ্টি কর, যাতে করে তোমরা জয়ী হতে পার। আমরা এই কাফেদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে অবশ্যই বাধ্য করব। আর এই সকল অপকর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই তাদের পেতে হবে। আল্লাহর দুশমনদের সেই প্রতিফল প্রতিদান হল দোজখের আগুন। সেখানেই হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। আমার আয়াত অস্বীকার করার এটাই হল যথোপযুক্ত শাস্তি। (ওখানে দোজখের মুখোমুখি হয়ে) কাফেরগণ বলবে, হে আমাদের রব, জিন ও ইনসানদের মধ্য থেকে যারা আমাদেরকে গোমরাহ্ করত, বিভ্রান্ত করত তাদের একটু দেখাও, যাতে করে তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ঠ করতে পারি। আর তারা নিক্ষিপ্ত হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অতল তলে।

সন্দেহ নেই, যারা এই মর্মে ঘোষণা করে যে, আল্লাহই আমাদের রব, অতঃপর এই ঘোষণার উপর গ্রহণ করে সুদৃঢ় অবস্থান, নিশ্চিতভাবে তাদের উপর নাজিল হয় ফেরেশ্তাগণ, তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে বলে ভয় কর না, চিন্তা কর না, বরং শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে। আমরা তোমাদের সাথী, এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। আর যা কিছু তোমরা কামনা করবে সবই তোমাদের হয়ে যাবে। আর এ সবই তোমরা পাবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ মেহমানদারীর সামগ্রী হিসেবে।" (সূরা আল ফুচ্ছিলাত- ২৬-৩২)

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। এর একটি হল নেতৃস্থানীয় কাফেরদের পক্ষ থেকে কুরআনের আওয়াজ স্তব্ধ করার লক্ষ্যে গৃহীত বল প্রয়োগ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে। সেই সাথে এই কর্মকাণ্ডের জন্যে যে শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন তাও ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণার একটি লক্ষ্য হল কাফেরগণ তাদের এই অন্যায় কাজ থেকে যেন বিরত হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্য- কুরআনের দাওয়াত পেশকারীদের মনে সান্ত্বনা প্রদান করা, যাতে তারা মানসিকভাবে দুর্বল না হয়ে দাওয়াত প্রদান, কুরআনের উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। তৃতীয় যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়- তাহলো এই সমাজের সাধারণ মানুষ নেতৃস্থানীয় মানুষের দ্বারাই বিভ্রান্ত হয়, বিপথগামী হয়, এর চূড়ান্ত পরিণতিতে আখিরাতে যখন শাস্তির মুখোমুখি হবে তখন ভুল বুঝতে পারবে, স্বীকারও করবে। কিন্তু কাজ হবে না। এই কথাটি কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে

وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ - رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا -

"আমরা তো সমাজের বড় বড় নেতাদের, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা অনুযায়ী কাজ করেছি। অতএব হে আল্লাহ, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সবার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি"।

(সূরা আল আহযাব- ৬৭-৬৮)

আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাতে দুর্বল ও সাধারণ মানুষের এই অনুতাপ অনুশোচনা খেদোক্তি ও ভুলের স্বীকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে মূলত তাদের নেতাদের অন্ধ আনুগত্য পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে এহেন প্রতিকূল পরিবেশে, প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে, তাদের রক্তচক্ষু এবং জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা করে যারা ঈমানের ঘোষণা দেয়, এর উপর অটল-অবিচল থাকতে সক্ষম হয়, তাদের প্রশংসা করেছেন, তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা ঈমানদার মানুষের জন্যে তার ঈমানের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদক্ষেপ এবং কার্যকর প্রেরণার উৎস। এ

www.bjilibrary.com

বিষয়টিকে আমরা আরো পরিষ্কার করে এভাবেও বুঝতে পারি। সমাজের উপর তলার প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, ভয়-ভীতির কারণে হোক আর লোভ-লালসার কারণেই হোক, যারা বিপথগামী হবে, তাদেরকেও ঐ পরিণতিই ভোগ করতে হবে, যে পরিণতি ভোগ করতে হবে, তাদের নেতাদের। আখিরাতে এ ওজর পেশ করে কোন লাভ হবে না যে, আমরা তো দুর্বল ছিলাম, তাদের কথা শুনতে বাধ্য ছিলাম। অতএব, আমাদের মাফ করা হোক। পক্ষান্তরে, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তাকে উপেক্ষা করে, তাদের সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যারা ঈমানের ঘোষণা দেবে এবং দাবি পূরণ করবে, তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে তার কাছে পুরস্কৃত হবে সর্বোত্তম পুরস্কারে।

শুধু এতটুকু বলেই আল্লাহ শেষ করেননি, ঐ প্রতিকূল অবস্থাতেও দাওয়াত অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দাওয়াতকে সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোত্তম কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। দায়ীর কথাকে সর্বোত্তম কথা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন এবং দাওয়াতের বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের খারাপ আচরণের মুকাবিলার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তম আমলের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা -

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ - وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

"তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানবজাতিকে আহ্বান করে আল্লাহর দিকে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (হে নবী!) নেকী এবং বদী সমান হতে পারে না। অতএব, বদীর মোকাবিলা কর নেকীর মাধ্যমে যা হবে সর্বোত্তম উপায়। তোমরা দেখতে পাবে, এর ফলে চিরশত্রু হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই গুণ তো কেবল

www.bjilibrary.com

তারাই অর্জন করতে পারে যারা ধৈর্যশীল। আর এই মর্যাদা কেবল তারাই অর্জন করতে পারে যারা ভাগ্যবান। যদি তোমরা এমন মুহূর্তে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্রকার উস্কানী অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি সব কিছুই শোনেন এবং জানেন।" (সূরা হুচ্ছিলাত- ৩৩-৩৬)

আলীমুন হাকীম আল্লাহ তায়ালা তার ভাষায় চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও দায়ীকে দাওয়াতী তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্যে, সর্বোত্তম ভাষায়, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যার সার কথা হল, পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক না কেন, যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আল্লাহর পথে মানবজাতিকে ডাকার কাজ অব্যাহত রাখতেই হবে। এ কাজটি করতে গিয়ে মানুষের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয়ে থাকে, তাই আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কথা হিসেবে বিবেচিত। সেই সাথে কথা প্রসঙ্গে এটাও এসে যায়, এই সর্বোত্তম কাজটি যে বা যারা করবে, তাদের ভাষাও হতে হবে সর্বোত্তম, মার্জিত এবং পরিশীলিত। শুধু ভাষা মার্জিত পরিশীলিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদেরকে হতে হবে উত্তম মানবীয় চরিত্রের অধিকারী, তাদের কথা ও কাজের মিল থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সত্য প্রকাশের সৎ সাহসও থাকতে হবে। ইসলামী দাওয়াতের মডেল চরিত্র সমস্ত নবী-রাসূলগণ। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, চরম বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদও (সা.) এভাবে বরং আরো ব্যাপকভাবে বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। নবীর অনুসারী হিসেবে যারা একই পথের পথিক হবে, তাদেরও ঐ একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দায়ীর করণীয় হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত দিক নির্দেশনা হল ধৈর্য ও সহনশীলতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। আল্লাহর রাসূল এই নির্দেশনা নিজে বাস্তবে কার্যকর করেছেন, তার ভাগ্যবান সাথী সঙ্গীগণও সার্থক ও সফলভাবে রাসূলের অনুসরণ করেছেন। যারা এভাবে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ ভাগ্যবান হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ –

"আল্লাহ তাদের প্রতি রাজী, আর তারাও আল্লাহর প্রতি রাজী"।

আল্লাহর এই ঘোষণা তার রাসূলের সাহাবীদের শানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

www.bjilibrary.com

দীনের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বাছাই করেছেন, কবুল করেছেন মূলত তাদের এহেন বৈশিষ্ট্যের কারণেই।

প্রতিকূল পরিবেশে দাওয়াতে দীনের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া সহজ সাধ্য নয়। তেমনি দাওয়াত দিতে গিয়ে বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে প্রতিপক্ষের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে তার প্রতিউত্তরে দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার করতে পারাটাও কিন্তু খুব একটা সহজ সাধ্য নয়। এর স্বীকৃতি আল্লাহ স্বয়ং দিয়েছেন এবং বলেছেন, এমনটি করতে সক্ষম হতে পারে কেবল তারাই যারা অসীম ধৈর্যের অধিকারী সেই সাথে ভাগ্যবান।

আজকের প্রেক্ষাপটে সূরায়ে 'হা-মীম আস্‌সাজদায়'– আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নির্দেশনার আলোকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তা হল প্রতিপক্ষের চরম খারাপ আচরণ সত্ত্বেও রাসূলের উসওয়ায়ে হাসানার অনুসারী হিসেবে উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে। চরম উস্কানী এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে দাওয়াত উপস্থাপন করে যেতে হবে হিকমত এবং মাওয়াজে হাসানা বা উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। অনুরূপ ভূমিকা পালনে সক্ষম হলে এর যে ফল পাওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন– অর্থাৎ 'জানের শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে' তার প্রতি একিন ও আস্থা রাখতে হবে। এই সময় শয়তানী শক্তি ভেতর থেকেও উস্কানী দিতে পারে, বাইরে থেকেও উস্কানী দিতে পারে। একজন ঈমানদার এবং দায়ীর কাছে এ বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে। এবং এর খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহর শরণাপন্ন হতে হবে। এভাবে আল্লাহর শরণাপন্ন হবার একটি দিক হল– আল্লাহর নির্দেশনা এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কী? তা জানতে হবে, এবং মানতেও হবে। দ্বিতীয় দিকটি হল; এই সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে- যথাযথভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। এখানে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে তার দুইটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সামীউন আর আলীমুন। সামীউন হিসেবে আমাদের সকল দোআ, সকল ফরিয়াদ সবার চেয়ে বেশী ভালভাবে উত্তমরূপে তিনিই শুনে থাকেন। আর আলীমুন হিসেবে আমরা কে কোন অবস্থায় আছি, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা কতটা ব্যাপক ভয়াবহ এটাও তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো জানার কথা নয়। তাই পূর্ণ আস্থা

www.bjilibrary.com

আমরা রাখতে পারি– আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলে– আল্লাহ অবশ্যই এর যথাযথ মূল্যায়ন করবেন।

এখানে এ বিষয়টিও আমরা পরিষ্কার করতে চাই। সত্যিকারের ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হঠকারিতা বা চরম পন্থা গ্রহণের কোন অবকাশই নেই। তথাকথিত জঙ্গি আচরণ তো দূরের কথা। ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনকারী তার আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের বলে, দাওয়াত উপস্থাপনে যুক্তি বুদ্ধি ও হিকমতের বলে যেমন প্রতিপক্ষের উপর নৈতিক বিজয় অর্জনে সক্ষম হবে, তেমনি দায়ীর উন্নত নীতিনৈতিকতা ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে সক্ষম হবে প্রতিপক্ষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে। আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তার সাহাবীদের (রা:) জীবনে আমরা সুস্পষ্টভাবে এই কুরআনী নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলনই দেখতে পাই প্রতি পদে পদে।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় কাফের মুশরিকদের সমরসজ্জা ও সরঞ্জামাদি এবং লোকবল অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরাজয়ের নৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যে সত্যটি তুলে ধরেছেন, তা হল কাফের মুশরিকগণ মুসলমানদের ওপর আক্রমণের হাতিয়ার চালাতে গিয়ে মনের ভেতর থেকেই বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের মনেই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, কাদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র চালাচ্ছি, তারা তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। এমন কি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে, তখন তারা আমাদের আমানত আত্মসাৎ না করে, যার যারটা তার তার কাছে ফেরৎ পৌছাবার ব্যবস্থা করেই দেশ ছেড়েছেন। মনের ভেতরে প্রতিপক্ষের নির্দোষ হবার এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতার অধিকারী হবার এই স্বীকৃতি ছিল বদরের ময়দানে মক্কার কাফের-মুশরিকদের বিরাট শক্তির মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয় লাভের মূল ভিত্তি। যে ভিত্তি তৈরী হয়েছিল রাসূলে পাক (সা.)-এর মক্কী জিন্দেগীর সীমাহীন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার ফলে। প্রতিপক্ষের দুর্ব্যবহারের মোকাবিলায় উত্তম ব্যবহার ও আচরণ প্রদর্শনের কালজয়ী আদর্শকে কেন্দ্র করে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপাদ মস্তক রহমতের জীবন্ত নমুনা হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.) কুরআনের প্রতিটি বাণী প্রতিটি শিক্ষা নিজে অনুসরণ করছেন এবং সেইভাবেই তার সাথীদের পরিচালনা করে

www.bjilibrary.com

চলেছেন। কুরআন নিজেই তার প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট যে এটা আল্লাহর কিতাব; মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কুরআন আল্লাহর তাওহিদের প্রতি ঈমান আনার জন্যে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে কখনও আসমান জমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান জানিয়েছে, কখনও তার নিজের জীবনের দিকে তার সৃষ্টি রহস্যের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছে, আবার কখনও অতীত ইতিহাসের কথাও স্মরণ করিয়েছে। অতীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাবের এবং প্রেরিত নবী-রাসূলগণের ভূমিকা কী ছিল–এটা বলে রাসূলের সাথী সঙ্গীদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সেই সাথে আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের বাহক নবীদের সাথে খারাপ আচরণকারীদের কী পরিণাম পরিণতি হয়েছে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। যার লক্ষ্য যুগপৎভাবে ঈমানদারদের সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি, অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা, সাবধান করা। কাফের-মুশরিকদের কাছে সত্য পৌছানোর দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী এবং নবীর অনুসারীদেরকে চরম ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ আচরণের মোকাবিলায় ভাল আচরণ প্রদর্শনের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখানোর উপর জোর দিয়েছেন। এরপরও যাদের বিবেক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যুক্তির কথা যাদের কাছে আর কোন গুরুত্ব পাচ্ছে না, তাদের ব্যাপারে মনে কষ্ট না রাখার উপর আল্লাহ জোর দিয়েছেন। কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে বেপরোয়া হবার নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে ঈমানদারদের আত্মবিশ্বাস বলিষ্ঠ ও মজবুত হয়। কাফের-মুশরিকগণও বুঝতে পারে যে এদেরকে আর কোনভাবেই নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

দায়ী আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে, আপোষহীন মনোভাব নিয়ে, পরিবেশের প্রতিকূলতায় ভীত শংকিত না হয়ে তার দাওয়াতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, সেই সাথে প্রতিপক্ষকেও এ বার্তা পৌছে দেয়–তাদের শত বাধা সত্ত্বেও এ দীন বিজয়ী হবেই। আর তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চিত পরাজয়। এই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশনাটি দায়ীর জন্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবহ এবং প্রণিধানযোগ্য। সূরায়ে হিজরের ৯৪ থেকে ৯৯ নম্বর পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

আয়াতগুলো আমাদের পড়তে হবে–ময়দানের অবস্থাকে সামনে রেখে আর এর আবেদনটি অনুভব করতে হবে হৃদয় দিয়ে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ - الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ -

“অতএব হে নবী, আপনাকে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, তা জোরগলায় প্রচার করে দিন। আর যারা শিরকে নিমজ্জিত তাদের মোটেই পরোয়া করবেন না। আপনাকে যারা বিদ্রূপ করছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তারা অচিরেই এর পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে। আমি জানি এরা আপনাকে নিয়ে যেসব বানোয়াট কথাবার্তা প্রচার করে তাতে আপনার অন্তরে কি ব্যথা-বেদনার কারণ হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করুন, তার যথাযথ প্রশংসা করার মাধ্যমে তার দরবারে সেজদাবনত হোন, আর সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে থাকুন যার আগমন অনিবার্য সত্য এবং অবধারিত”। (সূরা আল হিজর : ৯৪-৯৯)

আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রদানের পথে যত বাধা প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন, দীনের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোন রকম গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না, কোন রাখঢাক করা যাবে না, কমবেশী করা যাবে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। কোন হীনমন্যতার পরিচয় দেওয়া যাবে না। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে, মনের পূর্ণ দৃঢ়তার সাথেই তা তুলে ধরতে হবে। বিরোধিতাকারীদের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। এ ভরসায় যে তাদের শায়েস্তা করার জন্যে, সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাদের

www.bjilibrary.com

জঘন্য আচরণ দায়ীর মনে কী পরিমাণ কষ্টের কারণ ঘটায় তা আল্লাহর চেয়ে বেশী কেউ অবগত নয়। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার প্রতিবিধান করবেন। তবে এ জন্যে দায়ীকে আল্লাহর কাছে ধরণা দিতে হবে। আল্লাহর সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাঁর হামদ ও তাসবীহর মাধ্যমে তাঁর দরবারে সেজদাবনত হয়ে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে, তাঁর দীনে হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে যে দুঃখ, কষ্ট, বিপদ-মুছিবতের মুখোমুখি হতে হয় সে সবের মোকাবিলার শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় হল নামাজ এবং রবের নিরবিচ্ছিন্ন বন্দেগী। এটাই দায়ীর মধ্যে ছবর ও ইস্তেকামাতের শক্তি যোগাতে পারে, এটাই তার সাহস হিম্মত ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে, দিতে পারে হৃদয়ে গভীর অনাবিল শান্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি। সেই সাথে সারা দুনিয়ার চতুর্মুখী সমালোচনা, নিন্দাবাদ এবং বাধা প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলায় ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে টিকে থাকতে শক্তি যোগাবে এই প্রতিদানের আশায় যে, এর উপরই নির্ভর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়কালের অবস্থা আমরা আলোচনা করছিলাম। অন্তরের পূর্ণ দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.) দীনের দাওয়াত তার কওমের কাছে পৌছানোর জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কাফের–মুশরিকদের প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তা প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকারই করে চলছিল সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে। আর এজন্যে তারা সৃষ্টি করে চলছিল নানা অজুহাত। কখনও দাবি করছিল "আমাদেরকে তোমার নবুওতের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাও যাতে আমরা আস্থা আনতে পারি যে, তুমি অবশ্যই নবী।" সেই সাথে রাসূল সম্পর্কে প্রচার করতে থাকে নানা উদ্ভট কথাবার্তা। কখনও বলে এতো একজন গণক ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনও বলে এতো একজন যাদুকর আবার কখনও বলে এতো একজন কবি মাত্র। সেই সাথে একথাও বলতে থাকে তোমার কথা যদি আল্লাহরই কালাম হবে তা হলে আমাদের সমাজের সম্রান্ত ব্যক্তিরা কেউ তোমার সাথে নাই কেন? ঐ নীচু সমাজের গরীব লোকেরাই কেবল তোমার সঙ্গী হল কেন? এটাও প্রমাণ করে তোমার আনীত কিতাবের বাণীতে তেমন কোন সারবত্তা নেই। যদি

www.bjilibrary.com

থাকত তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমাদের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তোমার ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে আসতেন। রাসূলে পাক (সা.) যুক্তিগ্রাহ্য দলিল প্রমাণসহ তাদের আক্বিদা বিশ্বাসের ভ্রান্তি দূর করার এবং তাওহিদ ও আখিরাতের যথার্থতা বোঝাবার জন্যে চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আসছিলেন, কিন্তু কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হঠকারিতা নতুন নতুন রূপ নিচ্ছিল। এতে তাদের মধ্যে না কোন ক্লান্তি ছিল আর না ছিল কমতি।

এই পটভূমিতে আল্লাহর রাসূলের উপর নাজিল হয় সূরায়ে 'ত্বা-হা', সূরায়ে 'ওয়াকিয়া', সূরায়ে 'আশ্ শুয়ারা'।

সূরায়ে ত্বা-হা'র ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর আয়াতের দিকে আমরা লক্ষ্য করলে এমন মনোকষ্টের বেদনাদায়ক মুহূর্তের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিক নির্দেশনা পাই, তা খুবই অর্থবহ এবং বাস্তবসম্মত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

طٰهٰ - مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى - إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى

"ত্বা-হা' এই কুরআন তো আমি তোমার উপর এজন্যে নাজিল করিনি যে তুমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এটাতো একটি স্মারক গ্রন্থ একটি অনন্য উপদেশ তাদের জন্যে, যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়।"

এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তার নবীকে প্রধানতঃ সান্ত্বনা দিয়েছেন। সেই সাথে তার কর্মপরিধি এবং দায়িত্বের সীমা সম্পর্কেও সঠিক ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার নবীকে কোন অসাধ্য সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করেননি। যারা ঈমান আনতে আদৌ প্রস্তুত নয়, তাদেরকে ঈমান আনাতেই হবে, এ দায়িত্ব আল্লাহ তাঁর নবীকে অর্পণ করেননি। কুরআন নাজিল করা হয়েছে মূলত মানবজাতিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, তারা এর ভিত্তিতে ঈমান এনে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবে। আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বলে কোন কিছু নেই, ন্যায় আর অন্যায়ের ব্যাপারে যাদের কোন ধ্যান ধারণা নেই, তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনার জন্যে নবীর এত পেরেশান হবার কোন কারণ নেই।

www.bjilibrary.com

এই সান্ত্বনার বাণী শোনাবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তার সর্বময় ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে মূলত তাঁর সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়েছেন এই বলে-

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى -

"আপনি উচ্চস্বরে কিছু যদি বলতে চান, তাহলে মনে রাখবেন তিনি অনুচ্চস্বরে বলা কথা, এমন কি একেবারে গোপন অব্যক্ত কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ সেই মহান সত্তা! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ বা সার্বভৌমসত্তা নেই, যার আছে উত্তম গুণবাচক নাম।" (সূরা ত্বা হা : ৭-৮)

এর পর তদানীন্তন পরিস্থিতির আলোকে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্যে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনের আচরণ ও তার পরিণাম পরিণতির ঘটনা শুনানো হয়েছে।

মক্কার কাফের-মুশরিকদের সাথে আহলে কিতাবের অনুসারী ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের ওঠা-বসা ছিল। বিশেষ করে ইয়াহুদীদের আলেমদের এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল সে সময়ে। তাই মুসা (আ.)-এর নবুয়্যাতের ব্যাপারে মোটামুটি তাদের একটি ধারণা ছিল। অতএব তার নবুয়্যাতের ঘোষণাটি কিভাবে এসেছিল, তার নবুয়্যাতের ঘোষণার পর সেই সময়ের স্বৈরশাসক ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিভাবে বিরোধিতা করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে মুসা (আ.) ও তাঁর সাথীগণ কী ভূমিকা পালন করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে, এজন্যে যাতে রাসূলের (সা.) সাথীগণ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এখানে আমরা শুধু ফেরাউনের পক্ষে যাদুর প্রতিযোগিতায় যারা মুসা (আ.)-কে জব্দ করতে এসে ঈমানের ঘোষণা দিল, অতঃপর ফেরাউনের পক্ষ থেকে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো সত্ত্বেও তারা ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকল, সেই ঘটনার বর্ণনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

www.bjilibrary.com

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى - قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى - قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

"অবশেষে যাদুকরগণ সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং বলে উঠল, আমরা মুসা (আ.) এবং হারুনের রবের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিলাম। ফিরাউন বলে উঠল, আমার অনুমতি ছাড়াই, তোমরা ঈমান আনলে? এতেই প্রমাণিত হল যে (মুসা আ.) এই ব্যক্তিই তোমাদের বড় গুরু, যে নাকি তোমাদেরকে এই যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। আমি অবশ্য অবশ্য উল্টা দিক থেকে তোমাদের সকলের হাত এবং পা কেটে ফেলব। আর তোমাদেরকে লটকিয়ে ছাড়ব খেজুর গাছের মাথায়। আর তোমরা এটাও জানতে পারবে আমাদের উভয় পক্ষের মধ্য থেকে কার শাস্তি কত কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী।" (ফেরাউনের এই হুমকি ও দম্ভোক্তির পর) যাদুকরগণ বলল- কসম সেই সত্তার যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকের মত উজ্জ্বল প্রমাণ আসার পরও আমরা তোমার কথাকে এই সত্যের উপর প্রাধান্য দিব–এটা হতেই পারে না। তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পার। তুমি তো বড়জোর এই দুনিয়ার জিন্দেগীর মধ্যেই কিছু করতে পার। আমরা নিশ্চিতভাবে ঈমান এনেছি আমাদের রবের প্রতি এ আশায় যাতে করে তিনি আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন, বিশেষ করে ঐ যাদুকরীর অপরাধ থেকে, যে ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই সর্বোত্তম এবং তিনিই অবিনশ্বর।" (সূরা ত্বা হা : ৭০-৭৩)

www.bjilibrary.com

মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যে এখানে যে শিক্ষণীয় বিষয় আমরা লক্ষ্য করি, তার একটি হল; তারা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যাতের প্রমাণ স্বরূপ কিছু নিশানা কিছু অলৌকিকত্বের দাবি করছিল। অতীতে এরূপ ঘটনা দেখার পরও তাদের মত লোকেরা ঈমান আনতে সক্ষম হয়নি। অতএব তাদের কথা মত কোন অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করা হলেই যে তারা ঈমান আনবে এর এমন কোনই গ্যারান্টি নেই। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়টি হল, ফেরাউনের শক্তিমত্তা, প্রতিপত্তি, তার জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও যাদের ঈমান আনার তারা ঈমান এনেছে। চূড়ান্ত শাস্তির হুমকিও তাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

অপর দিকে প্রভাবশালী লোকদের চাপের মুখে ছিল রাসূলের যেসব মজলুম ঈমানদার সাহাবীগণ, তাদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে এসেছে ফেরাউনের ভাড়াটে যাদুকরদের কাছে মুসা (আ.)-এর নবুওয়াত সত্য প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে ঈমানের ঘোষণা প্রদান এবং এর উপর অটল অবিচল থাকার ঘটনাটি। যাদুর খেলায় তারা তাদের যাদুকরী বিদ্যায় সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেও যখন পরাস্ত হয়, তখন তাদের দিল সাক্ষী দিল মুসা (আ.) তাদের মত কোন যাদুকর নন। তিনিও যাদুকর হলে তাদের যাদু বিদ্যার এই দুর্দশা হত না। অতএব তারা মুসা (আ.)কে সত্য নবী হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিল এমন ভাষায় যাতে ব্যাপারটি তাৎক্ষণিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা ফেরাউনের পক্ষ জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে মুসা (আ.) এবং তার ভাই হারুন (আ.) এর পক্ষ অবলম্বন করছেন। তাদের এই ঈমানের ঘোষণার সাথে সাথেই ফেরাউনের পক্ষ থেকে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির ভয় দেখানো হল। তারা বিনা দ্বিধায় সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ঈমানের উপর দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করল বলিষ্ঠতার সাথে। ফেরাউনের দম্ভোক্তিকে তারা চ্যালেঞ্জ করেছে যে ভাষায় তাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তারা বলেছে-

فَاقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

"তুমি যা খুশি করতে পার, তোমার কর্তৃত্ব তো এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ।"

অর্থাৎ অল্পসময়ের মধ্যেই আল্লাহর তাওহিদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে

আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমানও যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জনে সক্ষম হয়।" এই পর্যায়ে রাসূলের (সা.) সাথীদের উপরও জুলুম হচ্ছিল, কিন্তু ফেরাউন তার নিজের ভাড়া করা যাদুকরদের পক্ষত্যাগের কারণে যে শাস্তির হুমকি দিয়েছিল তার ভয়াবহতা ছিল আরো অনেক বেশী। এরপরও তো তারা টলেনি ও দুর্বলতা দেখায়নি। বরং ছবর ও ইস্তেকামাতের পরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূলের (সা.) তখনকার সাথীদের জন্যে যেমন এই ঘটনা ছিল প্রেরণার উৎস, এবং অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়, তেমনি আজকের দিনে এবং আগামীতেও যারা রাসূলের (সা.) পথে চলবে, চলার সিদ্ধান্ত নিবে তাদের জন্যেও এটা শিক্ষণীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

মক্কী জিন্দেগীর মধ্যবর্তী স্তরে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথী সঙ্গীদের যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, বস্তুবাদী বা জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে সাফল্যের আশা করা তো দূরের কথা, সামান্যতম পথ চলাও কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। ইসলাম মানুষের বস্তুগত চাহিদা অস্বীকার না করলেও নিছক বস্তুবাদ নির্ভর আদর্শ নয়। তাই এর প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে নিছক বস্তুবাদী জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করলে চলবে না। বস্তুবাদ ও জড়বাদের উর্ধ্বে খোদায়ী হেদায়াতের ভিত্তিতেই এর কর্মসূচী কর্মকৌশলসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ আদর্শের যারা প্রতিপক্ষ তাদের চিন্তাভাবনাসহ যাবতীয় কার্যক্রম এই দুনিয়ার সফলতা ও ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। আর ইসলামের কার্যক্রম আবর্তিত হয়ে থাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জিন্দেগীর সফলতা ও ব্যর্থতাকে ভিত্তি করে। অবশ্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আখিরাতের জিন্দেগীকে, আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতাকে।

ইসলামের মূল আহ্বান আল্লাহর তাওহিদ বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যার অনিবার্য দাবী হল দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্বের ও বাদশাহীর স্বীকৃতি দেওয়া। বিশেষ করে আখিরাতের চূড়ান্ত বিচারের মালিক তিনি। তাঁর বিচার থেকে রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দুনিয়ার জীবনে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা

www.bjilibrary.com

প্রয়োগের সীমিত কিছু সুযোগ দিলেও আখিরাতের জিন্দেগীতে এর কোনই সুযোগ নেই। সেই আখিরাতের জবাবদিহির ব্যাপারে উদাসীনতাই মানুষের সমাজে অশান্তি অনাচারের, শোষণ নিপীড়নের প্রধান কারণ। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব বা ছহিফার ভিত্তিতে মানুষকে শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায় ইনসাফের যে পথে আহ্বান করেছেন, অন্যায় অনাচার ও শোষণ নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তির যে সন্ধান দিয়েছেন, তার সার কথা ছিল জীবন জিন্দেগীর সকল দিক ও বিভাগে এক আল্লাহর তাওহিদ বা একক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নেওয়া এবং এর জন্যে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতে হবে আখিরাতের জিন্দেগীতে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আখিরাত বিশ্বাসের মূল কথা হল, এই দুনিয়ার জীবনটা স্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। এই দুনিয়ার জীবনটাই শেষ কথাও নয়। এই জীবনের পর আবার আমাদের জীবিত করা হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের হিসাব দিতে হবে। সেই হিসাবের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে, মানুষ হিসেবে কার জীবন সফল আর কার জীবন হবে ব্যর্থ। নবী-রাসূলদের দাওয়াত অস্বীকারকারীগণ নবীদের নবুওয়াত ও তাদের উপরে নাজিলকৃত কিতাব বা ছহিফার যেমন বিরোধিতা করেছে, এটা অলীক ও কাল্পনিক দাবি বলে উড়িয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে তেমনি আল্লাহর তৌহিদকেও অযৌক্তিক বলার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে আখিরাতের জীবন এবং মৃত্যুর পরে জীবিত হবার বিষয়টি একেবারেই অবাস্তব, অমূলক বলেই ক্ষান্ত হয়নি, এটাকে পাগলের প্রলাপ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে, নাজিলকৃত কিতাব ও ছহিফাসমূহকে মানবজাতির জন্যে রহমত ও নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে এ সবের উপর ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং সংবেদনশীলভাবে। সেই সাথে তৌহিদ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েছেন আসমান-জমিন ও তার ভেতরকার গোটা সৃষ্টি লোকের সৃষ্টি রহস্যকে আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন রূপে উপস্থাপন করে। আর এই রহস্যের সঠিক সন্ধান যারা পায় তারা

www.bjilibrary.com

স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় আখিরাতের জীবনের সত্যতা ও বাস্তবতাকে।

আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্য ছাড়াও মানুষের নিজের জীবন নিয়েও চিন্তাভাবনার আহ্বান জানানো হয়েছে। মানুষ খাদ্যসহ দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু গ্রহণ করে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেও তৌহিদ এবং আখিরাতের ব্যাপারে তার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে মৃত্যু রহস্য নিয়ে যদি মানুষ তার বিবেককে কাজে লাগায় তাহলে আল্লাহর একক কর্তৃত্ব এবং আখিরাতের সম্ভাব্যতা বরং অপরিহার্যতার প্রতি অনায়াসেই তার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে মানুষের মৃত্যু যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি সত্য গোটা সৃষ্টি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সাথে এটাও সত্য যে, মৃত্যুই শেষ কথা নয়। মৃত্যুর পর আবার তাকে জীবিত করা হবে। যিনি আসমান জমিনের স্রষ্টা, যিনি মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার তাদের সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। বিচারের পর পুরস্কার হিসেবে জান্নাত এবং শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের যে কথা বার বার বলা হয়েছে, আর কাফের-মুশরিকগণ যাকে অলীক, কাল্পনিক ও পাগলের প্রলাপ বলে অট্টহাসি হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, তা সময় মত অবশ্যই অকাট্য বাস্তবতা রূপে দেখা দেবে সকলের সামনে। সকলেই তার দুনিয়ার জীবনের আচরণের ভুল সেদিন স্বীকার করবে, দুনিয়ায় আবার ফিরে এসে আল্লাহর হুকুম মানার জন্যে কাকুতি-মিনতিও করবে। কিন্তু এসব কিছুই আর কোন কাজে আসবে না। এই বুঝটাই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কুরআনের মাধ্যমে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মক্কী জিন্দেগীর এই পর্যায়ে নাজিলকৃত সূরা আল ওয়াকেয়ার মাধ্যমে।

আল্লাহর এই জমিনে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব সকলের জন্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূল প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতে। এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে চূড়ান্ত জবাবদিহিতা করতে হবে আখিরাতে। আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ্ তায়ালা হবেন সেই চূড়ান্ত বিচার দিনের একচ্ছত্র মালিক। সেদিন তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে "আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার, আল্লাহ নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, একমাত্র ঐ আল্লাহর যিনি পরম পরাক্রমশালী।" ঐ চূড়ান্ত বিচারের মুহূর্তে কারো চাচা, মামা, খালু কোন কাজে আসবে না। একমাত্র

www.bjilibrary.com

আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ রেহাই পাবে না। রাসূল (সা.)-কে তাই এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রভাবশালী কারো আত্মীয় হবার কারণেই ঐ দিন কারো মুক্তির উপায় থাকবে না। নবী মুহাম্মাদ (সা.) যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা সকলের জন্যে ইনসাফের কথা বলে, এটা সকলের জন্যে যেমন প্রযোজ্য, নবীর (সা.) নিজের জন্যেও প্রযোজ্য। অতএব, আত্মীয় হবার কারণেও কারো রেহাই নেই। এই কথাটা সুস্পষ্ট করে সবাইকে জানিয়ে দেয়া ছিল ঐ সময়ের দাবি। সূরায়ে আশ-শুয়ারা ২১৪ থেকে ২২০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত হেদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে যথাসময়ে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ - وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ - الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ - إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـ

"হে নবী! আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভয় দেখান, সতর্ক এবং সাবধান করুন, আর ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করুন, নম্র ব্যবহার করুন। কিন্তু তারা যদি আপনার নাফরমানী করে, তাদের বলে দিন তোমরা যা কিছু করছ, তার দায়-দায়িত্ব আমি বহন করব না, এর সকল দায়ভার বহন করতে হবে তোমাদেরকেই। আপনি ভরসা করুন সেই মহাশক্তিধর দয়াময় আল্লাহর উপর, যিনি আপনাকে সেই সময়ও দেখে থাকেন যখন আপনি থাকেন দাঁড়ানো অবস্থায়। আর সেজদায় অবনত ব্যক্তিদের মাঝে আপনার বিচরণকেও তিনি লক্ষ্য করে থাকেন। অবশ্যই তিনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" (সূরা আশ শুয়ারা - ২১৪-২২০)

আল্লাহর এই নির্ভেজাল দীনে যেমন স্বয়ং নবীর জন্যে কোন অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা নেই। তেমনি নেই তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কোন প্রকারের পক্ষপাতিত্বের অবকাশ। এখানে প্রত্যেকের সাথে আচরণ করা

www.bjilibrary.com

হবে তার কর্মফলের ভিত্তিতে। কোন বংশ পরিচয়, কারো সাথে কারো বিশেষ সম্পর্ক এখানে কোন কাজে আসবে না। বিপথগামীতার এবং অসদাচরণের ফলে আল্লাহ তায়ালার আযাব বা শাস্তি সবার জন্যে একইভাবে প্রযোজ্য। এমনটি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই যে, অন্য সবাই যে অপরাধের কারণে পাকড়াও হবে, নবীর আত্মীয় হবার কারণে সেই অপরাধ করে কেউ বেঁচে যাবে। এ জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলে পাক (সা.)-কে তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনকে এই মর্মে সতর্ক সাবধান করার নির্দেশনা দেয়া হল যে, তাদের সাফ সাফ বলে দিন, তাদের ঈমান, আকিদা ও আমল-আখলাক যদি তারা পরিচ্ছন্ন না রাখে তাহলে শুধু নবীর আত্মীয়-স্বজন হওয়ায় পার পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

তাফসিরে উল্লেখ আছে এই আয়াতকটি নাজিল হবার পর রাসূলে পাক (সা.) তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন শাখার লোকদেরকে ডেকে ডেকে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের সতর্ক করে তিনি বলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, হে আব্বাস, হে, রাসূলের (সা.) ফুফু সুফিয়া, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, দোজখের আগুন থেকে তোমরা তোমাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা কর। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। আমার নিকট তোমরা দুনিয়ার মাল-সামান যা চাওয়ার চাইতে পার।"

অতঃপর আল্লাহর নবী (সা.) সাফা পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে উঠে গেলেন অতি প্রত্যুষে এবং কুরাইশ গোত্রের সকল খান্দানের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে ডাক দিলেন সকাল বেলার বিপদ সংকেত প্রদান করে। আরবে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা প্রথা ছিল কেউ কোন বিপদের আশঙ্কা করলে এভাবেই সবাইকে সে ব্যাপারে অবহিত করত।

রাসূলের (সা.) এই আওয়াজ শোনা মাত্র লোকেরা সাফা পাহাড়ে এসে জড়ো হয়। যাদের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি, তারা অন্য কারো মাধ্যমে খবর জানার ব্যবস্থা করে।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) এই ভাষণটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তিনি সমবেত লোকদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর দিক থেকে শত্রু তোমাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস

www.bjilibrary.com

করবে? সকলে বলল হ্যাঁ, কারণ তুমি আজ পর্যন্ত কোন দিন মিথ্যা বলনি। তাহলে শোন, আল্লাহর কঠিন শাস্তির ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। তোমরা সেই আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। আল্লাহর মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোনই কাজে লাগব না। কিয়ামতের দিন কেবল খোদাভীরু লোকেরাই হবে আমার আত্মীয়-স্বজন। এমন যেন না হয় যে, অন্যরা নেক আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে আর তোমরা সেখানে হাজির হও দুনিয়ার অভিশাপ নিয়ে। সেদিন তোমরা 'হে মুহাম্মাদ' বলে ডাকলে আমার কিছু করার থাকবে না। অবশ্যই দুনিয়ায় তোমাদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমি এখানে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার এ সম্পর্ক রক্ষার সব চেষ্টাই করে যাব। রাসূলের (সা.) এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে, কিভাবে তিনি আল্লাহর এই নির্দেশনা কার্যকর করেছেন, যার প্রধান বক্তব্য ছিল দীন ইসলামে নবী (সা.) বা তাঁর খান্দানের জন্যে কোন বিশেষ সুযোগ নেই। যা উত্তম তা সবার জন্যে উত্তম আর যা ক্ষতিকর তা সকলের জন্যেই সমানভাবে ক্ষতিকর। রাসূল (সা.)-এর এই বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি ন্যায় ইনসাফের পতাকাবাহী, তিনি সব মানুষের জন্যে সমভাবে শান্তি ও কল্যাণের মূর্তপ্রতীক।

ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

ইতিপূর্বে আমরা ছাফা পাহাড়ের উপর থেকে প্রদত্ত রাসূলে পাক (সা.)-এর ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.) কে একটি বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করতে বললেন। ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত কুরাইশদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণটি ছিল প্রকৃত পক্ষে একটি আম দাওয়াত যা আজকের দিনের জনসভার ভাষণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর এই ভোজসভাটি ছিল একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে খোলামেলা আলোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ছাফা পাহাড়ের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদি আমরা মনে করি ইসলামের 'আম দাওয়াত' পেশ করার জন্যে আয়োজন করা হয়েছিল, তাহলে এই ভোজসভার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল 'দাওয়াতে খাস'।

এতে কেবল মাত্র আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকজনকেই দাওয়াত করা হয়েছিল। এখানে হযরত হামজা, আবু তালিব ও হযরত আব্বাসসহ

www.bjilibrary.com

সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভোজসভায় যথারীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর নবী মুহাম্মদ (সা.) দাড়িয়ে বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। তার বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মাত্র দুইটি বাক্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাবভাষার দিক থেকে ছিল খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি প্রথম বাক্যে উল্লেখ করেন, "আমি এমন একটি বিষয়বস্তুসহ প্রেরিত হয়েছি, যা ইহকাল এবং পরকাল উভয়কালের জন্যে জামিন স্বরূপ। দ্বিতীয় বাক্যে উল্লেখ করলেন, (মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের)। এই মহান দায়িত্ব পালনে কে আছে আমাকে সাহায্য করার? রাসূলের (সা.) এই ঘোষণার পর গোটা ভোজসভায় নেমে আসে এক গভীর নীরবতা ও নিস্তব্ধতা। হঠাৎ হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। এই কিশোর আলীর দাঁড়ানো ভোজসভায় আগত লোকদের মাঝে আরো বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। সকলের অবাক দৃষ্টি এবার হযরত আলীর দিকে, 'এই কিশোর ছেলেটা আবার কী বলে'। এবার কিশোর আলীর ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হল, "যদিও আমি বয়সে আপনাদের সকলের চেয়ে ছোট। যদিও আমার পদযুগল ক্ষীণ এবং চক্ষু রোগগ্রস্ত তথাপি এই কঠিন দায়িত্বপালনে আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

কুরাইশদের জন্যে এই ঘটনা ছিল অপূর্ব ও বিস্ময়কর। কারণ তাদের সামনে এই ঘটনা থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠল, তাহল মাত্র দু'জন ব্যক্তি গোটা বিশ্বের ভাগ্য পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, যার মধ্যে আবার একজনের বয়স মাত্রই দশ বছর। কিশোর আলীর বক্তব্য শুনে অনেকেই হেসে উঠল।

ইতিপূর্বে আমরা হিজরাতে হাবশার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, রাসূলে পাক (সা.)-এর সাথীদের ১০১ জন হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার পর মাত্র ৪০ জন তার সঙ্গে রয়ে যায়। এদের নিয়েই আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত প্রদান অব্যাহত রাখেন। সেই সাথে দাওয়াতে দীনের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতাও বাড়তে থাকে। বিশেষ করে তিনটি ঘটনার কারণে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অনেকটা বেসামাল হয়ে উঠে। এর একটি ছিল হযরত হামজার (রা.) ইসলাম গ্রহণ। কারণ তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেমন ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

তেমনি ছিলেন যথেষ্ট সাহস হিম্মতের অধিকারী একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। অপরটি হাবশা বা আবিসিনিয়ায় রাসূলের সাহাবাদের (রা.) একটি বড় অংশের হিজরাত করে যাওয়া। যার ফলে তাদের নিজেদের গোত্রে এবং পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারো পরিবারে সৃষ্টি হয় শোক ও ব্যথা বেদনার পরিস্থিতি। কারো পরিবারে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ। এ কারণে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে দ্রুত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভ দুটোই বাড়তে থাকে। রাসূলের দাওয়াত আরো বেশী বেশী মানুষ গ্রহণ করলে তাদের পক্ষে এটা প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। তাই বিরোধিতা তীব্র থেকে তীব্রতর করতে থাকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের এই হতাশা ও ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে দেয় হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। তাই ইসলামী দাওয়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ করার জন্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মরিয়া হয়ে উঠে।

হযরত ওমরের (রা:) ইসলাম গ্রহণের পটভূমিটি খুবই শিক্ষণীয়। সর্বকালের সর্বযুগের দাওয়াতে দীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে এতে রয়েছে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক এবং পাথেয়। প্রথমত: আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত ওমরের (রা:) মত ব্যক্তির ইসলাম কবুলের জন্যে আন্তরিকভাবে দো'য়া করেছিলেন। যদিও হযরত ওমর (রা:) ঈমান আনার আগে রাসূলের (সা.) বিরোধিতায় ছিলেন কট্টরতম ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু তিনি মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ইসলাম কবুলের তৌফিক হলে, যেমন জোরে শোরে বিরোধিতা করছিলেন তেমনি জোরে শোরে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ভূমিকা রাখবেন, এমন সম্ভাবনা আঁচ করেই আল্লাহর রাসূল (সা.) এভাবে দো'য়া করেছিলেন। দায়ী যাকে বা যাদেরকে দাওয়াত দিতে আগ্রহী, তাদের অন্তর যাতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে খুলে দেন এজন্যে দো'য়া করাই তার প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ।

হযরত ওমরের মধ্যে ইসলাম কবুলের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির পেছনে তিনটি ঘটনা বাস্তবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এর একটি স্বয়ং হযরত ওমরই (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম কবুলের আগে একদিন আল্লাহর রাসূল (সা.) কে উত্ত্যক্ত করার জন্যে বাড়ী থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার পূর্বে নবী মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে হারামে পৌঁছে যান। আমি গিয়ে তাকে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পাই। তখন তিনি নামাজরত অবস্থায়

www.bjilibrary.com

সূরায়ে আল হাক্কাহ পড়ছিলেন। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। কুরআনের ভাষা শৈলী ও বাক্য বিন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাধুর্যে আমি বিস্মিত হলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে হল, কুরাইশরা যেমন বলে থাকে লোকটি একজন যাদুকর, সত্যি সত্যি তিনি একজন যাদুকর। আমার এরূপ ভাবার সাথে সাথে রাসূলের (সা.) মুখ থেকে উচ্চারিত হল–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ - تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

"এ এক সম্মানিত রাসূলের কথা কোন কবির কথা নয়। তোমরা অতি অল্প লোকই ঈমান এনে থাকে।" (এর পর আমি মনে মনে বললাম। লোকটি কবি না হলেও গণক তো বটেই। তখনই তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল) "আর না এটা কোন গণকের কথা, তোমরা তো খুব কমই চিন্তাভাবনা করে থাক। এটা তো অবতীর্ণ হয়েছে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।"

(সূরা আল হাক্কা : ৪০-৪১)

এই ব্যাপারে দ্বিতীয় ঘটনাটি হিজরাতে হাবশার প্রতিক্রিয়া। ইবনে ইসহাক, সিরাতে ইবনে হিশাম ও তাবারী প্রভৃতি সীরাত গ্রন্থে হযরত লায়লা বিনতে আবি হাসমার বর্ণনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

হযরত লায়লা বিনতে আবি হাসমা ছিলেন হযরত ওমরের (রা.) নিকট আত্মীয়। তিনি তার স্বামীর সাথে হিজরত করেন। তিনি বলেন "আমি হিজরতের জন্যে মাল সামান প্রস্তুত করছিলাম, এই সময় আমার স্বামী কোন কাজে বাইরে ছিলেন। এমন সময় ওমর এলেন এবং তখনও তিনি শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। আমরা তার কাছ থেকে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছি। কিন্তু সে সময় তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হিজরতের প্রস্তুতির ব্যস্ততা দেখছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, আবদুল্লাহর মা তবে কি চলেই যাচ্ছ? আমি বললাম হ্যাঁ, তোমরা যখন আমাদের উপর বড়ো জ্বালাতন করলে, আমাদের উপর জুলুম করলে, তখন আমরা খোদার জমিনে কোথাও

www.bjilibrary.com

বেরিয়ে পড়ি, যেখানে তিনি আমাদের এ বিপদ থেকে বাঁচার কোন পথ বের করে দেবেন।" এর পর ওমর (রা.) বললেন, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।" তাঁকে সে সময় এমন অশ্রু গদ গদ দেখছিলাম যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। আমাদের দেশ ত্যাগ করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে দেখে তিনি অতিশয় ভগ্নহৃদয়ে চলে গেলেন।

হযরত ওমরের মনে ইসলাম কবুলের আকর্ষণ সৃষ্টির তৃতীয় এবং সর্বশেষ ঘটনা তার বোন ফাতেমার ঈমানের উপর অবিচল থাকার মর্মস্পর্শী দৃশ্য। ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। হযরত ওমর ইসলামের বিরোধিতার এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলকে (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তরবারী হাতে নিয়ে। পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেল তার গোত্রের নুয়াইম বিন আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির সাথে। যিনি ইসলাম কবুল করলেও তার মুসলমান হওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। তিনি ওমরের এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আমি ধর্মত্যাগী মুহাম্মদকে হত্যা করতে চাই, যিনি কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। আমাদের সবাইকে অজ্ঞ, মূর্খ সাব্যস্ত করছেন, আমাদের ধর্মের নানা ভুলত্রুটি দেখাচ্ছেন, আমাদের মাবুদদের গালি-গালাজ করছেন। নুয়াইম বললেন, খোদার কসম, হে ওমর তোমার মন তোমাকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করেছে। তুমি কি মনে কর, মুহাম্মদকে হত্যা করার পর বনি আবদে মনাফ তোমাদেরকে জীবিত রাখবে? তুমি প্রথমে তোমার ঘরের খবর নিয়ে দেখ। হযরত ওমর বললেন– আমার কোন ঘরের খবর নিতে বলছ? নুয়াইম বললেন, তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ বিন যায়েদ এবং তোমার বোন ফাতেমা ইসলাম কবুল করেছে এবং মুহাম্মদের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। এ কথা শোনার সাথে সাথেই হযরত ওমর তাঁর যাত্রার গতি উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং সোজা পৌঁছে গেলেন তার ভগ্নির বাড়ীতে। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত উপস্থিত ছিলেন, তার হাতে ছিল একটি সহিফা যাতে সূরায়ে ত্বা-হা লেখা ছিল। তিনি ফাতেমাকে এ থেকে শিক্ষা দিতেন। ওমরের আগমন টের পেয়ে ভীত শংকিত হয়ে খাব্বাব ইবনে আরাত পাশে কোথাও লুকিয়ে যান। আর সহিফাটুকু ফাতেমা লুকিয়ে নেন তার উরুর নিচে।

কিন্তু ওমর দরজার কাছ থেকে হযরত খাব্বাবের কেরা'আত শুনতে পেয়েছিলেন। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বললেন, গুন গুন করে তোমরা কি বলছিলে যা আমি শুনতে পেলাম। সাঈদ বললেন, তুমি কিছুই শুননি। তিনি বললেন, না, আমি শুনেছি। খোদার কসম আমি জানতে পেরেছি তোমরা উভয়ে মুহাম্মদের দীন কবুল করেছে। এর পর তিনি তার ভগ্নিপতিকে মারপিট শুরু করেন। তার বোন ফাতেমা স্বামীকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসলে ওমর তাকেও এমনভাবে মারপিট করেন যে, তার মাথা ফেটে যায়। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বলে ওঠেন, হ্যাঁ আমরা ইসলাম কবুল করেছি এবং আল্লাহর রাসূলের (সা.) উপর ঈমান এনেছি। তুমি এখন যা খুশি করতে পার। বোনের এই সাহসী উচ্চারণে ওমর স্তম্ভিত হয়ে যান। তার রাগ গোস্‌সা যা পৌঁছে গিয়েছিল হিংস্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে, নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, লজ্জিত হন নিজের আচরণের জন্যে আর অজ্ঞতা থেকে ফিরে আসেন আলোর পথে।

এর পর তিনি বোন ফাতেমাকে বললেন, যে সহিফা তোমরা একটু আগে পাঠ করছিলে, ওটা আমাকে দেখাও না। দেখি মুহাম্মদ (সা.) এমন কোন সে জিনিস নিয়ে এসেছেন। হযরত ওমর ছিলেন একজন শিক্ষিত লোক। তাই তিনি ওটা পড়তে চাইলেন। তার বোন বললেন, আমার ভয় হয় তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলবে। তিনি বললেন, না সে ভয়ের কোন কারণ নেই। ওমর তার মাবুদের কসম খেয়ে বললেন, পড়ার পর তিনি ওটা ফিরিয়ে দেবেন। এখন বোন ফাতেমার মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হল। ওমর মুসলমান হয়ে যাবেন এ সম্ভাবনা তাদের কাছে বেশ উজ্জ্বল মনে হল। এরপর ফাতেমা তাকে বললেন, ভাই শিরকের কারণে তুমি নাপাক। আর এই সহিফা পবিত্র লোক ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। ওমর উঠে গিয়ে গোসল করে এলেন। তখন ফাতেমা তার হাতে সহিফাখানা দিলেন। তিনি সহিফাখানি হাতে নিয়ে সূরায়ে ত্বা-হার প্রাথমিক অংশ পড়ে বললেন, কতই না সুন্দর ও উঁচুমানের এই বাণী। হযরত ওমরের মুখের এই কথা শোনা মাত্র হযরত খাব্বাব বের হয়ে এসে বললেন, হে ওমর আশা করি আল্লাহ্ তোমাকে নবীর (সা.) দো'আর উপযোগী বানাবার জন্যে বাছাই করেছেন। আমি গতকালই নবীকে (সা.) এই দো'য়া করতে শুনেছি– "হে খোদা! আবুল হাকাম বিন হিশাম অথবা ওমর বিন খাত্তাব দ্বারা ইসলামকে সাহায্য কর। অতএব হে

www.bjilibrary.com

ওমর, আল্লাহর দিকে এসো, আল্লাহর দিকে এসো। উত্তরে ওমর বললেন, আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চল যাতে আমি মুসলমান হয়ে যাই।

হযরত খাব্বাব (রা.) বললেন, তিনি ছাফা পাহাড়ের নিকটে একটি বাড়ীতে দারে আরকামে তার সাথী-সঙ্গীসহ অবস্থান করছেন। হযরত ওমর তরবারী কোমরে বেঁধে হুজুর এবং তাঁর সাথীদের বাসস্থানে পৌছে দরজায় আঘাত করলেন। হুজুরের একজন সাথী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে, ওমর তরবারীসহ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ভীত শংকিত হয়ে ফিরে গিয়ে হুজুরকে এ খবরটি দিলেন। হযরত হামজা বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি নেক নিয়তে এসে থাকে তাহলে আমরাও তার সাথে ভাল আচরণ করব। নতুবা তার তরবারী দিয়েই তাকে খতম করব। অতঃপর হুজুর (সা.) বললেন, তাকে আসতে দাও। হুজুরের নির্দেশনানুযায়ী ওমরকে ভেতরে আসার অনুমতি দেওয়া হল। তিনি আসামাত্র হুজুর নিজে সামনে এগিয়ে গেলেন। ওমরের চাদর মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে সজোরে টানলেন এবং বললেন ইবনে খাত্তাব কি মনে করে এখানে এলে? খোদার কসম আমি মনে করি তুমি ততক্ষণ ফিরে আসবে না, যতোক্ষণ না আল্লাহ্ তোমার উপর কঠিন আজাব নাজিল করেন। এই সময়ে হযরত ওমর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং রাসূলের আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনার জন্যে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। একথা শোনামাত্র আল্লাহর রাসূল (সা.) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন আল্লাহু আকবর। ফলে বাড়ীর সবাই জেনে ফেলল যে হযরত ওমর মুসলমান হয়েছেন। ফলে মুসলমানদের সাহস হিম্মত বেড়ে গেল। হযরত হামজার পর ওমরও মুসলমান হলেন, এখন এ দুজন মুসলমানদের জন্যে শক্তির স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হল। হযরত ওমরের (রা.) ও হযরত হামজার (রা.) সাহসী ভূমিকায় মুসলমানদের প্রকাশ্য পদচারণা ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ড নতুন করে প্রাণ পেল। অবশ্য এর প্রতিক্রিয়াও হল সাংঘাতিক।

শি'আবে আবু তালিবে বন্দী জীবন অবসানের ঘটনা

ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি হিজরাতে হাবশার ফলে প্রতিটি পরিবারে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এ প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ লক্ষ্য করল তাদের প্রবল

www.bjilibrary.com

বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মক্কা নগরীতে ভিতরে ভিতরে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। বাইরের গোত্রের লোকদের মধ্যেও ইসলাম কবুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি ইসলামের দাওয়াত আরব দেশের সীমা অতিক্রম করে আবিসিনিয়ায় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। বাদশাহ নাজ্জাশী প্রকাশ্যে মুসলমানদের সমর্থক হয়ে পড়েন। সেখান থেকে ইসলাম কবুলের জন্যে রাসূল (সা.)-এর নিকট বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আসতে থাকে। উপরন্তু হযরত হামজার পাশে হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হৃদয়ের জ্বালা আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ ঐ ঘটনার পর শুধু মক্কায় অবস্থানরত মজলুম মুসলমানদের সাহসই বাড়েনি, বরং হাবশায় হিজরত করে যাওয়া মুসলমানদের সাহসও বেড়ে যায়। এই পটভূমিতেই মুহাম্মদ (সা.) ও মুসলমানদের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রকে চাপের মুখে ফেলার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল গোত্রের নেতৃবৃন্দ সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সর্বসম্মতভাবে। ঐ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে তারা আল্লাহর কসম করে শপথ নিল, যতক্ষণ পর্যন্ত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের হাতে সোপর্দ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মেলামেশা, বিয়েশাদী, কথা-বার্তা বেচাকেনাসহ কোন প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক রাখা হবে না। বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব পরিবার ছাড়া কুরাইশদের সকল পরিবারের কর্তা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর ও সত্যায়নের পর তা কাবা ঘরে লটকিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবুওয়াতের সপ্তম বছরে পয়লা মুহাররমে। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথী, সঙ্গী ও আশ্রয় দানকারী বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের লোকদেরকে একত্রিত করে কোথাও বন্দি করে রাখা। এমনকি একযোগে সবাইকে হত্যা করে ফেলা। উক্ত চুক্তির মেয়াদ ঘোষণা করা হয় যতদিন না বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার জন্যে তাদের হাতে সোপর্দ করবে, ততদিন এই বয়কট চুক্তি বহাল থাকবে।

অবশেষে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আবু তালিব আর কোন উপায় না দেখে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের গোত্রের সবাইকে সাথে নিয়ে শিআবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তারা দীর্ঘ তিন বছর শিআবে আবু তালিব নামে এই উপত্যকায় অবস্থান করেন। এ সময়টি তাদের জন্যে কত

www.bjilibrary.com

যে কঠিন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই উপত্যকায় অবরুদ্ধ লোকদের জন্যে সকল প্রকারের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের কাছে খানাপিনার দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণের সকল রাস্তাই অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। আবু লাহাব তার গোত্র ত্যাগ করে অবরোধকারীদের কাতারে শামিল হয়। সে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের কিছু খরিদ করতে দেখলে উচ্চ-স্বরে ব্যবসায়ীদের বলত তাদের কাছে এমন চড়া দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। তারপর আমি তোমাদের কাছ থেকে ওগুলো খরিদ করে নিব যাতে তোমাদের কোন লোকসান না হয়। অবরুদ্ধদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়েছিল যে, শুধু পিপাসার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শিআবে আবু তালিবের সীমানার বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এরা শুধু হজ্জের সময় বের হত। অতঃপর পরবর্তী হজ্জ পর্যন্ত নিজেদের মহল্লায় অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য হত। এ সময়ে শুধু হযরত খাদিজার (রা.) ভাতিজা হাকিম বিন জুযাম এবং নাদলা বিন হাশেম বিন আবদে মানাফের ভাইপো হিশাম বিন আমর আল আমেরী গোপনে আত্মীয়দের হক আদায় করতে থাকেন। একবার আবু জাহেল হাকিম বিন জুযামকে তার ফুফুর নিকট খাদ্য নিয়ে যেতে দেখে ফেলে এবং বাধা দেয়। সে হাকিম বিন জুযামকে ধরে ফেলে বলল, বনি হাশেমের জন্যে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছো, আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি। আমি তোমাকে সারা মক্কায় লাঞ্ছিত না করা পর্যন্ত ছাড়ব না। এমন সময় খাদিজার (রা.) আর একজন নিকট আত্মীয় আবুল বাখতারি বিন হিশাম সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি হচ্ছে? আবু জেহেল বলল, এ বনী হাশিমের কাছে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও। এ তার ফুফুর খাদ্য তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি তার নিজের জিনিস তার কাছে যেতে দেবে না? আবু জেহেল এ কথা মানতে রাজী না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া এবং মারামারি শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে আবুল বাখতারি উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে আঘাত করলে আবু জেহেলের মাথা ফেটে যায়। এ ঘটনাটি হযরত হামজা (রা.) লক্ষ্য করছিলেন। এতে দুজন কাফের-মুশরিক লজ্জিত হয়ে তাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করে দেয়, যাতে বনি হাশেম এতে আনন্দিত না হয়।

www.bjilibrary.com

হিশাম বিন আমর আল আমেরীও চুপি চুপি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের সাথে আত্মীয় সুলভ আচরণ করতে থাকেন। তিনি এক অদ্ভুত পন্থায় রাতে অবরুদ্ধদের জন্যে খাদ্য সামগ্রী পাঠাতেন। রাতের বেলায় উটের পিঠে খাদ্য সামগ্রী বোঝাই করে উটকে শিআবে আবি তালিবের মধ্যে হাঁকিয়ে দেওয়া হত। অবরুদ্ধ লোকজন উট ধরে খাদ্য সামগ্রী নামিয়ে রেখে বাইরে হাঁকিয়ে দিত। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাকেও ধমকের স্বরে বাধা দিত। এখানে আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করা হয়। তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন, একে ছেড়ে দাও, সেতো আত্মীয়দের হক আদায় করছে। মক্কার ধর্মান্ধ ও কট্টরপন্থী কাফের-মুশরিক নেতৃবৃন্দ ক্রোধ ও আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য করার মানসেই বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের লোকদের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল। কিন্তু বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিব পরিবার দুটির আত্মীয়তার বন্ধন ছিল গোটা মক্কাব্যাপী সুবিস্তৃত। তদানীন্তন মক্কায় এমন কোন পরিবারই ছিল না, যাদের সাথে এই দুই পরিবারের আত্মীয়তা ছিল না। অতএব এই অমানবিক অবরোধের কারণে মুহাম্মদ (সা.) এবং তার অনুসারীদের সাথে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব পরিবারের লোকদের করুণ কাহিনীর ফলে মক্কার সকল পরিবারের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় সহানুভূতি এবং সমবেদনার। অমানবিক এই অবরোধের ফলে নারী ও শিশুদের করুণ আহাজারী আর্তচিৎকার তাদের নিকটাআত্মীয় স্বজনের বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করে।

দীর্ঘ তিন বছর যাবত চলতে থাকে এই বিবেক বর্জিত অমানবিক অবরোধ কার্যক্রম। পানাহারের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের শিশুদের আর্তচিৎকার শিআবে আবু তালিবের গণ্ডিসীমা পেরিয়ে আশপাশের জনপদেও পৌছত। আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে যারা আশপাশে অবস্থান করত, তারা এ দ্বারা সাংঘাতিকভাবে বিচলিত ও আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ত। নির্যাতিত নিপীড়িতদের আহাজারী কান্নাকাটির আওয়াজ যাদের কানে পৌছত তারাও মাঝে মধ্যে অস্থির হয়ে পড়তো। অবরোধের তৃতীয় বছরের শেষের দিকে বনী হাশেমের সাথে বিয়েশাদী সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কয়েকটি পরিবার বনী আবদে মানাফ, বনী কুসাই

www.bjilibrary.com

এর লোকেরা এই বর্বরোচিত অমানবিক অবরোধের জন্যে পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার করা শুরু করল। একপর্যায়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় "আমরা আত্মীয়তা বন্ধ করার অপরাধে অপরাধী। এ জঘন্য আচরণ দ্বারা আমরা পারিবারিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে চলেছি। এই প্রতিক্রিয়া এক পর্যায়ে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি রাসূলে পাক (সা.) ও তার সাথী-সঙ্গীসহ বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিবের লোকদের এহেন কঠিন মুহূর্তে অবরোধ চলার কারণে দু'জন সহৃদয় ব্যক্তি সাধ্যমত অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। আত্মীয়তার হক আদায়ের ক্ষেত্রে চরম প্রতিকূলতা এবং প্রবল চাপ উপেক্ষা করেও অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা হাকিম বিন জুযাম এবং নাদলা বিন হাশেম বিন আবদে মানাফের ভাইপো হিশাম বিন আমর আল আমেরী। এই দু'জনের একজন হিশাম বিন আমর আল আমেরী এই অবরোধের ফলে যেন কোন বড় রকমের মানবিক বিপর্যয় না ঘটে যায়, এজন্যে এর অবসান ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি বিষয়টি নিয়ে আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে মতবিনিময় শুরু করেন।

সর্বপ্রথম তিনি বনি মাখজুম গোত্রের প্রধান যুহাইর বিন আবু উমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। যুহাইর বিন আবু উমাইয়া ছিলেন উম্মে সালমার ভাই এবং নবী করিম (সা.) এর ফুফু আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে। তিনি বেশ আবেগতাড়িৎ কণ্ঠে যুবাইরকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে যুহাইর তুমি আরামে থাকবে, আনন্দ ফুর্তি করবে, পেটপুরে খাবে, বিয়েশাদীসহ সকল সামাজিক কাজকর্ম স্বাচ্ছন্দে করে যাবে, আর তোমার নানার দিকের আত্মীয়রা অনাহারে থাকবে, তাদের নারী শিশুদের আর্তচিৎকার বুকফাটা কান্নায় হৃদয় বিদারক দৃশ্য সৃষ্টি হচ্ছে এমনটি কি করে মেনে নিতে পার? অথচ এই ধরনের কাজটি যদি আবু জাহেলের নানার গোষ্ঠীর লোকদের সাথে করা হত, তাহলে কি আবু জাহেল তা কখনও মেনে নিত?, যুহাইর বললেন, হিশাম, আমি একা কী করতে পারি। আরো কাউকে যদি সাথে পাওয়া যেতো তাহলে এসব অবরোধের দলিল ছিন্ন না করে ছাড়তাম না। হিশাম বললেন, একজন তো আমি আছিই। যুহাইর বললেন, আরো একজন যোগাড় কর। তারপর হিশাম বিন আমর আল

www.bjilibrary.com

আমেরী বনী নওফল বিন আবদে মানাফের সর্দার মুতয়েম বিন আদির সাথে দেখা করেন। তাকে বলেন, অবরোধের ফলে বনী আবদে মানাফের দুটি পরিবার (বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব) আজ ধ্বংসের পথে, তুমি কি এতে খুশি? এভাবে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে আর তুমি কি বসে বসে তামাশা দেখতে থাকবে? এদের এভাবে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে শেষ করে দেওয়ার কাজে যদি তুমি সাহায্য করতে থাক, কুরাইশদের প্রতি তোমার সমর্থন অব্যাহত রাখ, তাহলে একদিন এ অবস্থা তোমারও হবে। একথা শোনার পর মুতয়েম বিন আদি বললেন, আমি কী করতে পারি? হিশাম বিন আমর আল আমেরী বললেন, একজন তো আমি আছি আর একজন হল যুহাইর বিন আবি উমাইয়া। মুতয়েম বললেন, আরো একজনকে সাথে নেওয়ার চেষ্টা কর।

তারপর হিশাম বিন আমর আল আমেরী বনি আসাদ বিন আব্দুল ওয্যার প্রধান আবুল বাখতারী আস বিন হাশিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তার সাথেও সেই আলাপই করলেন যা ইতিপূর্বে যুহাইর বিন আবি উমাইয়া এবং মুতয়েম বিন আদির সাথে করেছিলেন। তিনিও অন্যান্যের মতই বললেন, আরকি কেউ আছে যে, আমাদের সাথে থাকবে? হিশাম বললেন হ্যা আমি তো আছিই, তাছাড়া আমাদের সাথে যুহাইর বিন আবি উমাইয়া এবং মুতয়েম বিন আদি থাকবে। তিনি একথা শুনে বললেন বাস আর একজন দেখ।

অত:পর হিশাম বনী আসাদ বিন আব্দুল ওয্যার অন্যতম নেতা জাময়া বিন আল আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের সাথে আলাপ করে এই কাজে সহযোগিতার জন্যে সম্মত করেন।

সংঘাত সংঘর্ষ নয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই যে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, সেই অন্ধকার জাহেলী যুগের কুরাইশ নেতৃবৃন্দের একটি অংশের ভূমিকা থেকেও আমরা আজ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। একটু আগে আমরা হিশাম বিন আমর আল আমেরীর উদ্যোগে তাকেসহ যে পাঁচজন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নামের সাথে পরিচিত হলাম, 'শিআবে আবু তালিবে' তিন বছরের অবরোধ অবসানে তারা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা পাঁচজন প্রথমে মক্কার উঁচুভূমি হাজুনে

www.bjilibrary.com

একত্রিত হয়ে শলাপরার্শ করেন এবং অবরোধের দলিল ছিন্ন করার জন্যে কিভাবে অগ্রসর হবেন তার কলাকৌশল নির্ধারণ করেন। অত:পর সিদ্ধান্ত হল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বৈঠকে প্রথমে জুবাইর এ ব্যাপারে প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন আর বাকীরা সাথে সাথে তাকে সমর্থন করে বক্তব্য দেবেন। পূর্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিশাম, জুবাইর, মুতয়েম, আবুল বাখতারী ও জাময়া পরের দিন সকালে কুরাইশদের সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যুহাইর সাতবার কাবা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ সেরে মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, "শোন মক্কাবাসী, আমরা খেয়ে পরে থাকব, আর বনী হাশেম ধ্বংস হয়ে যাবে? আমরা তাদের কাছে কিছু বিক্রি করতে পারছি না, তাদের কাছ থেকেও কিছু কিনতে পারছি না। খোদার কসম, অবরোধের এই দলিল ছিঁড়ে ফেলা না হলে আমি তোমাদের সাথে কিছুতেই বৈঠকে বসবো না। আবু জেহেল তাৎক্ষণিকভাবে চেঁচিয়ে উত্তর দিল না, তুমি মিথ্যা বলছো এ দলিল কখনই ছিঁড়া যাবে না। যুহাইরের সাথী জাময়া সাথে সাথে বললেন না হে আবু জেহেল তুমি সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। আমরা তখনও এতে রাজী ছিলাম না।

আবুল বাখতারী সাথে সাথে জাময়াকে জোরালোভাবে সমর্থন জানিয়ে বললেন জাময়া ঠিক বলেছে, অবরোধের ঐ দলিলে যা কিছু লেখা হয়েছে তাতে আমরা তখনও রাজী ছিলাম না। আর আমরা ওটা স্বীকারও করি না। মুতয়েম বিন আদিও তাদের দুজনের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রেখে বললেন এরা উভয়ে সত্য কথা বলেছে। আল্লাহকে সামনে রেখে এই দলিলে যা কিছু লেখা আছে তা থেকে আমরা আমাদের দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি। হিশাম বিন আমর আল আমেরীও সাথে সাথেই এই বক্তব্য সমর্থন করলেন। তখন আবু জেহেল বলতে লাগল এ এক ষড়যন্ত্র যা রাতে কোথাও বসে পাকানো হয়েছে।

ইতোমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে যায় একটি অলৌকিক ও কুদরতি ঘটনা। ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম ও বালাযুরী বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলকে (সা.) জানানো হল যে অবরোধের দলিলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাসহ যেসব জুলুম নির্যাতনের কথা লেখা ছিল তা উঁই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। ঐ দলিলে শুধু আল্লাহর নামই বাকী রয়ে গেছে। রাসূল

www.bjilibrary.com

(সা.) বিষয়টি তার চাচা আবু তালিবকে অবহিত করেন। আবু তালিব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব কি তোমাকে এ খবর দিয়েছেন? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবু তালিব তার ভাইদের কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন, তারা আবু তালিবের অভিমত জানতে চাইলেন। আবু তালিব বললেন, মুহাম্মদ তো আমার কাছে কোন দিন মিথ্যা বলেনি।

এরপর আবু তালিব নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে করণীয় কী তা জানতে চাইলেন। রাসূলের (সা.) পরামর্শ অনুযায়ী আবু তালিব তার সাথীদের নিয়ে এমন সময় হারাম শরীফে পৌছেন যখন যুহাইর এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সেই টীমের সাথে আবু জেহেলের বিতর্ক এবং বাক বিতণ্ডা চলছিল। কুরাইশ সর্দারগণ সে বিতর্ক নিয়ে কী করা যায় চিন্তাভাবনায় ছিল। আবু তালিব সেখানে পৌছেই সবাইকে সম্বোধন করে বললেন আমরা একটি বিষয় নিয়ে এসেছি–এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে সঠিক জবাব আশা করি। এরপর তিনি বললেন, আমার ভাইপো মুহাম্মদ (সা.) চুক্তিপত্র সম্পর্কে আমাকে কিছু অবগত করেছেন। তোমরা চুক্তিপত্র আনো দেখি, আমার ভাইপোর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাক এবং তাতে যা লেখা আছে তা মিটিয়ে ফেল। আর যদি তার কথা মিথ্যা হয়, তাহলে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিব। আবু তালিবের এ কথার পর তারা বলল, আপনি তো সুবিচারের কথাই বলেছেন। অবশেষে চুক্তিপত্র এনে খুলে দেখা হল, রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন তাই সঠিক। ফলে কুরাইশ কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। আবু তালিব তাদেরকে বললেন, এবার পরিষ্কার হয়েছে এসব জুলুম নিপীড়ন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে তোমরাই দায়ী। এখন আর কোন্ অপরাধে আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকব। এর পর আবু তালিব তার সাথী সঙ্গীদের নিয়ে কা'বা বায়তুল্লাহর সাথে দেহ জড়িয়ে এই ভাষায় দো'আ করলেন;

"হে খোদা যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে, আমাদের ব্যাপারে যা কিছু তুমি তাদের জন্যে হারাম করেছো সেই সব কিছুকে তারা হালাল করে নিয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।" এই কথা বলে আবু তালিব তার সাথীদেরকে নিয়ে তার শিআবের দিকে চলে গেলেন। তার চলে যাওয়ার পরপরই কুরাইশদের অনেকেই এই জুলুম

www.bjilibrary.com

নিপীড়নের নিন্দা করলেন যা বনী হাশিমের প্রতি করা হয়েছিল। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মুতয়েম বিন আদি, আজি বিন কায়েস, হামযা বিন আসওয়াদ, আবু বাখতারী বিন হাশিম এবং যুহাইর বিন আবি উমাইয়া উল্লেখযোগ্য। অত:পর তারা সশস্ত্রভাবে শিআবে আবি তালিবে গিয়ে অবরোধের অবসান ঘটান এবং সবাইকে যার যার বাড়ীতে যাবার আহ্বান জানান। শিআবে আবি তালিবে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ অবরোধের এই মর্মান্তিক ও অমানবিক ঘটনার মধ্যেও কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক আমরা আমাদের চিন্তার খোরাক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

এক: বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের যেসব লোকেরা ঈমান না আনা সত্ত্বেও নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথী সঙ্গীদের সাথে এই দীর্ঘ তিন বছর মানবেতর জীবনযাপন করল, কিন্তু কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে মুহাম্মদ (সা.) কে তুলে দিলনা; এর মধ্যে একটা বড় মানবীয় দিক ফুটে উঠে। আত্মীয়তার এই বন্ধনের প্রতি কুরআন গুরুত্ব দিয়েছে রাসূল (সা.) গুরুত্ব দিয়েছেন। মূলত এটা আল্লাহরই বিধান। রাসূল (সা.) তার ছাফা পাহাড়ের উপর থেকে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, আমি আখেরাতের বিচারের দিনে তোমাদের দায়িত্ব নিতে পারব না। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক আত্মীয়তার হকের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকবে। মুহাম্মদ (সা.) বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সন্তান হবার কারণে তাঁর পক্ষ থেকে পেশকৃত দীনের দাওয়াত কবুল না করলেও তারা বিপদের মুহূর্তে নিজেদের সন্তানকে ত্যাগ করেনি। শত্রুর হাতে তুলে দিতে রাজী হয়নি। সর্বযুগে সর্বকালেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বসহ বিবেচনা যোগ্য।

দুই: হিশাম বিন আমর আল আমেরী, যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মুতয়েম বিন আদি, আবুল বাখতারী আস বিন হাশিম ও জাময়া বিন আল আসওয়াদ এই পাঁচ জনের ভূমিকা মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পাবার দাবি রাখে। একটি মানবিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে তারা যেভাবে আন্তরিকতার সাথে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্যে দেন-দরবার, আলাপ-আলোচনা ও শলাপরামর্শ করলেন, কৌশলী ভূমিকা পালন করলেন তা অবশ্যই লক্ষণীয় এবং শিক্ষণীয়।

www.bjilibrary.com

তিনঃ রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথীগণ জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, মজলুম হিসেবে, সততা-সত্যতার প্রতীক হিসেবে কখনও জুলুমের প্রতিশোধ চিন্তায় জালেমের ভূমিকায় যাননি। এ অবস্থায় সাময়িকভাবে অসহনীয়, অবর্ণনীয় দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন নিপীড়নের মাঝে অবস্থান করতে হলেও এক পর্যায়ে বিবেকবান মানুষের সহানুভূতি অর্জনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। আর এই পথ ধরেই আসে আল্লাহর কুদরতী সাহায্য।

আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর ঘটনা

দীর্ঘ তিন বছরের একটানা অবরোধের কারণে জুলুম নির্যাতনের যে করুণ অধ্যায়টি চলছিল, তার অবসান হলেও ঈমানদার লোকদের, নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথীদের পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। বরং নতুন নতুন রূপে আরো পরীক্ষা আসতেই থাকল। অবরোধের অবসানের পর নবী মুহাম্মদের (সা.) জন্যে তার মক্কী জিন্দেগীর দশম বছরটি-শোকের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসে। এই বছরেই তাঁর অভিভাবক, সকল বিপদ আপদেও যিনি বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়েছেন রাসূল (সা.)-কে সেই অভিভাবক চাচা আবু তালিব পরলোক গমন করলেন। তিনি মৃত্যু বরণ করলেন–শিআবে আবি তালিবের অবরুদ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তির মাত্র ছয় মাস পরে। এর মাত্র মাস খানেকের ব্যবধানে ইন্তিকাল করলেন রাসূলের জীবন সঙ্গীনী তার রেছালাতের প্রতি প্রথম ঈমানের ঘোষণা দানকারী হযরত খাদিজা (রা.)। এই দুই ব্যক্তির ইন্তেকালের ঘটনা আল্লাহর রাসূলের জন্যে ছিল সাংঘাতিক শোকাবহ। দুটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যেন দু:খের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল আল্লাহর রাসূলের (সা.) উপর। তদুপরি কাফির-মুশরিকদের জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল সাংঘাতিকভাবে। রাসূলকে (সা.) অভিভাবকহীন মনে করে কাফির-মুশরিকদের সাহস বেড়ে গেল। আবু তালিবের কারণে তারা জুলুম নির্যাতন করতে যেভাবে বাধা পেত, এখন আর তেমন কোন বাধা দেবার কেউ থাকল না মনে করে তারা নতুন করে জুলুম নির্যাতন ও নিপীড়নের পথ বেছে নিল।

www.bjilibrary.com

চাচা আবু তালিব এবং বিবি খাদিজার (রা.) অবর্তমানে কাফির-মুশরিকদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা রাসূলের (সা.) সাথে যেসব মর্মান্তিক আচরণ করে তার দু' একটি নমুনা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

"ইবনে ইসহাক ওরওয়া বিন যুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন কুরাইশদের একব্যক্তি বাজারের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি সে অবস্থায় বাড়ী ফিরে গেলে তার শিশু কন্যা ফাতিমা মাথা ধুয়ে মাটি সাফ করছিলেন আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। রাসূল (সা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না মা, আল্লাহ তোমার বাপের সহায়।"

ইমাম বোখারী (র.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) একদিন কাবার পাশে নামাজ আদায় করছিলেন। একই সময়ে আশে পাশে কুরাইশগণও আপন আপন বৈঠকে বসা ছিল। এদের মধ্য থেকে আবু জেহেল নির্দেশ দিল, অমুকের বাড়ী থেকে জবাই করা উষ্ট্রের নাড়ীভূঁড়ি ও রক্তের ঝুড়ি উঠিয়ে এনে সেজদারত অবস্থায় মুহাম্মদের পিঠে বা কাঁধের উপর রেখে দিতে পারে, এমন কেউ আছে কি? এ কথার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে চরিত্রহীন এক দুর্বৃত্ত ওকবা বিন মুয়াইত উঠে গিয়ে দ্রুত ঐরূপ ময়লা আবর্জনা ও নাড়ীভূঁড়ি এনে রাসূলের পিঠে অথবা কাঁধের উপর রেখে দিল। এভাবে রাসূল (সা.) দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়ে রইলেন, মাথা তুলতে পারলেন না। এ অবস্থা দেখে কুরাইশ সর্দার কাফির-মুশরিকগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে অট্টহাসি করতে থাকে, গড়াগড়ি করতে থাকে। খবরটি কেউ একজন ফাতেমাকে (রা.) পৌঁছাতেই তিনি দৌড়ে এসে এসব ময়লা আবর্জনা টেনে টেনে ফেলে দিলেন। এর পর কুরাইশদের সম্বোধন করে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাদের উপর বদদো'আ করেন। কিন্তু ফাতেমাকে (রা.) কুরাইশদের কেউ আর কিছু বলতে যায়নি। নামাজ শেষে হুজুর (সা.) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তুমিই কুরাইশদের ব্যাপারে ফায়সালা কর। কুরাইশগণ মুহাম্মদ (সা.)-এর বদ দো'আকে খুবই ভয় করত। কুরাইশদের ব্যাপারে তুমি ফয়সালা কর কথাটি কয়েকবার উল্লেখ করেন। এতে কুরাইশদের আনন্দ উল্লাস গড়াগড়ি সব হঠাৎ থেমে যায়। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এরপর রাসূল (সা.) নাম উল্লেখ করে, আবু জেহেল, উৎবা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবিয়া, অলিদ বিন ওতবা বিন রাবিয়া, উমাইয়া বিন খালাফ,

www.bjilibrary.com

ওকবা বিন আবি মুয়াইত এবং উমারা বিন অলিদকে বদ দো'আ দেন।" উল্লেখযোগ্য, নবী মুহাম্মদ রাহ্মাতুললিল আলামীন তিনি সাধারণত গালির জবাবে, জুলুম অত্যাচারের জবাবে ক্ষমার জন্যে দো'আ করে অভ্যস্ত কিন্তু এইখানে বদ দো'আ করেছেন। কারণ কুরাইশদের এই আচরণ ছিল অযৌক্তিক অমানবিক এবং অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির, ফলে রাসূলের (সা.) মন থেকেই বদ দো'আ বেরিয়ে এসেছে। তাই আমরা দেখতে পাই এই হাদিসেই উল্লেখ করা হয়েছে "ঐ দিন ব্যতীত রাসূলকে (সা.) আর কোন দিন বদ দো'আ দিতে শোনা যায়নি।

এভাবে আবু তালিবের অবর্তমানে রাসূলের (সা.) উপর জুলুম নির্যাতন যখন চরমে পৌছে তখন একদিন আবু লাহাব হুজুরের (সা.) নিকট এসে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করে, যে তুমি যা করতে চাও করতে থাক। আবু তালিব থাকতে যেভাবে করেছ সেভাবেই করতে থাক, আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। এরপর হুজুব (সা.) বাড়ী থেকে বের হলে বাজারে একজন রাসূলকে (সা.) বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করলে আবু লাহাব এসে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। তখন লোকটি পালিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকে আবু লাহাব তার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছে। তার কথা শুনে কুরাইশের লোকেরা আবু লাহাবের কাছে এসে ঘটনা কী তা জানতে চাইলে আবু লাহাব বলে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের দীন ত্যাগ করিনি। কিন্তু এখন আমি আমার ভাইপোর সহযোগিতা করব। কারণ এখন তার কোন পৃষ্ঠপোষক নেই। কুরাইশ সরদারগণ বলল তুমি আত্মীয়তার হক আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল কাজই করেছ। এরপর কিছু দিন আল্লাহর রাসূল (সা.) নিরাপদে রইলেন। আবু লাহাবের কারণে তাকে উত্ত্যক্ত করা থেকে দুর্বৃত্তরা বিরত থাকল।

আবু লাহাবের এই ভূমিকার অবসান ঘটানোর জন্যে একটি কুটকৌশলের আশ্রয় নিল, আবু জেহেল ও ওকবা বিন মুয়াইত দু'জনে সলামর্শ করে। তারা আবু লাহাবকে বলল ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করে দেখ তার দাদা আর তোমার বাপ আবদুল মুত্তালিব কোথায় যাবে? আবু লাহাব নবীকে (সা.) একথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন তার কওম যেখানে যাবে, তিনিও সেখানে যাবেন। আবু লাহাব তার বন্ধুদেরকে হুজুরের (সা.) এ জবাব জানিয়ে দিলে তারা বলল, কিছু কি বুঝলে? এর অর্থ তোমার পিতাও

জাহান্নামে যাবে। আবার আবু লাহাব নবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, আব্দুল মুত্তালিব কি জাহান্নামে যাবে? রাসূল (সা.) বললেন হ্যা, এবং আবদুল মুত্তালিবের দীনের উপর যারা মৃত্যুবরণ করবে তারা সবাই হবে জাহান্নামী, একথা শোনামাত্র আবু লাহাব রেগে গেল এবং ঘোষণা করল খোদার কসম আমি সবসময়ই তোমার দুশমন থাকব। তুমি মনে কর আবদুল মুত্তালিব জাহান্নামী? এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল দু'টি এক: আবু লাহাব আবু তালিবের শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ গ্রহণের আশায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে আত্মীয়তার হক আদায়ের সাথে সাথে একটি সুযোগ সন্ধানী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দুই: তাকে এই পথ থেকে সরানোর জন্যে দুইজন ধুরন্ধর ব্যক্তি যে কুটচালের আশ্রয় নেয় তাও কিন্তু লক্ষণীয়। অন্ধকার সেই জাহেলী যুগে নবীর প্রতিপক্ষ, তাঁর দাওয়াতের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরাও বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা ও কুটকৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে আজকের দিনের কুটনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। সেই সাথে এ জিনিসটাও পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায় যে, কায়েমী স্বার্থ ও অহংবোধ এবং বাপ দাদার সূত্রে পাওয়া অন্ধ বিশ্বাসই ছিল সর্বকালে সর্বযুগে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়। যে কারণে আবু লাহাব নবী মুহাম্মদকে (সা.) সাহায্য করার জন্যে এক পা এগিয়ে এসেও আবার পিছু হটে যায়। শোনা গেছে, আবু লাহাব রাসূলকে (সা.) একথাও বলেছিল, ভাতিজা আমি বিশ্বাস করি তুমি সত্য নবী, কারণ তুমি কখনও মিথ্যা বলতে পার না। কিন্তু বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়ি কি করে ?

www.bjilibrary.com

(৪)

সাহাবীদের উপর অকথ্য নির্যাতন

রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার তের বছরের জীবনকে আমরা মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করার চেষ্টা করে আসছি। রাসূলে পাক (সা.)-এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মক্কী অধ্যায়ের যেসব ঘটনা থেকে আমরা বাস্তবে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি– কেবল মাত্র সেগুলোই সংক্ষেপে আলোচনা করছি। আমরা এ পর্যন্ত রাসূলের (সা.) মক্কী জীবনের চারটি স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা শেষ করেছি। তৃতীয় স্তরেরও উল্লেখযোগ্য আলোচনা প্রায় শেষের দিকে। সামনে রাসূলের (সা.) তায়েফ সফর ও তায়েফবাসীর লোমহর্ষক নির্যাতনের ও বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগের আলোচনার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের আলোচনাও শেষ হবে ইনশাআল্লাহ।

মক্কী অধ্যায়ের এই তৃতীয় স্তরে হিজরাতে হাবশা ও শিআবে আবি তালিবে বন্দী জীবন যাপনের পাশাপাশি রাসূল (সা.)-এর উল্লেখযোগ্য সাহাবীদের (রা.) উপর অকথ্য জুলুম, নির্যাতন ও তাদের ছবর এবং ইস্তেকামাতের ঘটনার উল্লেখ না করলে রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবনের আলোচনার হক কিছুতেই আদায় হতে পারে না। তাই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা না গেলেও আমরা এই পর্যায়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

রাসূলে পাক (সা.)-এর দাওয়াতে যাতে কেউ সাড়া দিতে না পারে সেজন্যে মক্কার কাফির-মুশরিকদের নেতৃবৃন্দ ব্যাপক প্রপাগান্ডামূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। হজ্জের মৌসুমে আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকদের মধ্যে রাসূল (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস- যা শুরু করা হত, তা মূলত সারা বছরই অব্যাহতভাবে চলতে থাকতো। তবে এই অপপ্রচার কাফির-মুশরিকদের জন্যে অবশেষে বুমেরাং হয়েছে। মুহাম্মদকে (সা.) কাছ থেকে দেখার,

www.bjilibrary.com

তিনি আসলে কি বলেন, এটা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় অনেকের মনে। যা পরবর্তীতে তাদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এতে নেতৃস্থানীয় কাফির-মুশরিকদের ক্রোধ আক্রোশ আরো বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় জুলুম নির্যাতনের পৈশাচিক কার্যক্রম। কারো ইসলাম কবুলের কথা শুনলেই তাকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে তার উপর শুরু হত অমানুষিক অত্যাচার। তারা ক্ষেত্র ভেদে মুসলমানদেরকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত। কোন প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ ইসলাম কবুল করলে তাদের উপর মানসিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করত. তাদেরকে বলতো তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মত্যাগ করলে– অথচ তারা তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞানী-গুণী ছিলেন। তোমরা যদি ইসলাম ত্যাগ করে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে না আসো, তাহলে আমরা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করে ছাড়ব। তোমাদেরকে বোকা হিসেবে গণ্য করে তোমাদের মান-মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করবো।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তাদের উপর এই বলে চাপ সৃষ্টি করতো যে, ইসলাম ত্যাগ কর, নতুবা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তোমাদের পেশা বন্ধ করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যাতে তোমাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করা লাগতে পারে। যারা ছিল দিন মজুর তাদের দিয়ে কাজ করানোর পর এই বলে মজুরী পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকতো যে, ইসলাম ত্যাগ কর, নতুবা কোন মজুরী দেওয়া হবে না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের উপর চালাতো পৈশাচিক শারীরিক নির্যাতন। এমন কি প্রভাবশালী সম্মানী লোকদেরকে বন্দী করে দৈহিক শাস্তি দেওয়া শুরু করা হয়। এক পর্যায়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাদের পরিবারের কোন সদস্য ইসলাম কবুল করলে তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে বলপূর্বক ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে হবে। ফলে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথী অনুসারীগণ সম্মুখীন হন বিরাট অগ্নিপরীক্ষার।

কুরাইশদের সিংহ পুরুষ হিসেবে পরিচিত নওফেল বিন খুয়ায়লিদ বিন আস আদাবিয়্যা হযরত আবু বকরের (রা.) মত সম্মানিত ব্যক্তিকে হযরত তালহার সাথে একত্রে বেঁধে ফেলে। কিন্তু এ দু'জন সম্মানিত ব্যক্তির পরিবার বানু তায়েমের লোকেরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এহেন

www.bjilibrary.com

নরাধম পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ইবনুল আদাবিয়্যার জন্যে আল্লাহর রাসূল (সা.) ক্ষোভে দু:খে বদ্ দো'আ করতে বাধ্য হন। তিনি আল্লাহর দরবারে এই বলে দো'আ করেন; হে আল্লাহ! ইবনুল আদাবিয়্যার অনিষ্টকারিতা থেকে আমাদেরকে রক্ষার দায়িত্ব তুমি স্বয়ং নিজ দায়িত্বে গ্রহণ কর। হযরত যুবাইর ইবনে আল আওয়ামকে তার চাচা চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে লটকিয়ে দিত এবং নিচ থেকে ধুঁয়া দিয়ে বলতে থাকতো ইসলাম ত্যাগ কর, ইসলাম থেকে ফিরে এসো। আর এই পাষণ্ডের জবাবে তিনি বলতে থাকেন, না, আমি কখনও কুফরী করব না। এভাবে হযরত ওসমানকে (রা.) তার চাচা হাকাম (মারওয়ানের পিতা) বেঁধে ফেলে এবং বলতে থাকে, তুমি বাপ-দাদার দীন ত্যাগ করেছো? তোমাকে ত কিছুতেই ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদের দীন ত্যাগ করেছো। জবাবে হযরত ওসমান (রা.) বলতেন, আমার যা কিছুই হোক না কেন এ দীন কখনই ছাড়ব না।

কা'বা বায়তুল্লাহর চাবির রক্ষক হযরত মুসয়াব বিন ওমায়েরের চাচাতো ভাই ওসমান বিন তালহা হযরত মুসয়াব বিন ওমায়েরের উপর ভয়ানক নির্যাতন চালায়। তাকে তার পরিবারের সকলের সহায়তায় বন্দী করে রাখে। তিনি বাধ্য হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এবং হাবশায় হিজরতকারী প্রথম কাফেলার সাথে শরীক হন। হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস ও তার ভাই আমেরকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে সাংঘাতিকভাবে নির্যাতন চালিয়েছে তাদের মাতা নিজে। কিন্তু তাদেরকে দীন ইসলাম ত্যাগ করাতে পারেনি। এক পর্যায়ে দু'ভাইকে তাদের মায়ের পক্ষ থেকে বলা হল, মায়ের হক আদায় করা তো আল্লাহর হুকুম। খোদার কসম তোমরা ইসলাম ত্যাগ না করলে আমি পানাহার করব না, ছায়াতে গিয়েও বসব না। একথা শুনে হযরত সা'দ পেরেশান হয়ে রাসূলকে (সা.) সব খুলে বললেন, 'তখনই নাজিল হল সূরায়ে আনকাবুতের আয়াতটি;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

"এবং আমরা মানবজাতিকে তাদের মা-বাপের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি এমন চাপ সৃষ্টি করে, যে চাপের ফলে তুমি

www.bjilibrary.com

আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে বস, যে ব্যাপারে তোমার কোনই জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের এমন কথা মানবে না। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভাল আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে।" (সূরা আল আনকাবুত-৮)

হযরত খালিদ বিন সাঈদের (রা.) উপর নির্যাতন

হযরত খালিদ বিন সাঈদ পিতা-মাতার অজান্তেই ইসলাম কবুল করেন। যখন পিতা-মাতা এটা জেনে ফেলে তখন তিনি তাদের ভয়ে পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। অত:পর তার পিতা তাকে খুঁজে বের করে এনে রীতিমত গালাগালি আর মারপিট করতে থাকে। যে কাঠের টুকরো দিয়ে হযরত খালিদ বিন সাঈদকে (রা.) মারা হচ্ছিল এক পর্যায়ে তা ভেঙ্গে যায়। তখন তার পিতা তাকে বলল, যে মুহাম্মদ আপন কওমের বিরোধিতা করছে, পৈত্রিক দীনের দোষক্রটি বের করছে, পূর্ব পুরুষের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে, তুই তার আনুগত্য মেনে নিয়েছিস?

হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.) প্রতি উত্তরে বলেন, খোদার কসম তিনি সত্যবাদী এবং আমি তাঁর অনুসারী। একথা বলার পর তার পিতা আবার তাকে মারপিট শুরু করে এবং বকাঝকা দিয়ে বলে নালায়েক তুই যেখানে খুশী চলে যা, আমার বাড়ীতে তোর খানা পিনা বন্ধ। এর উত্তরে খালিদ বিন সাঈদ (রা.) বলেন, আপনি আমার রিজিক বন্ধ করলে, আল্লাহ্ আমার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। অত:পর তিনি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথেই বসবাস করতে থাকেন। এমতাবস্থায় একদিন মক্কার পার্শ্ববর্তী কোন নির্জন স্থানে তিনি নামাজ পড়ছিলেন, ব্যাপারটি তার পিতা জানার সাথে সাথে তাকে ডেকে নিয়ে আবারো মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন ত্যাগ করার জন্যে চাপ দিলে তিনি বলেন, আমরণ তিনি এ দীনের উপর অবিচল থাকবেন, ত্যাগ করবেন না। তার পিতা আবু উহায়লা সাঈদ আগের মত একটি কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে তার মাথায় আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। কাঠের টুকরোখানা অবশেষে ভেঙ্গে যায়। এরপর তাকে তিন দিন একটানা অভুক্ত অবস্থায় বন্দি করে রাখা হয়। মক্কার অসহনীয় গরমের ভেতরই তিনি এ শাস্তি ভোগ করতে থাকেন। এরপর কোন এক সুযোগে তিনি পালিয়ে যান এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম কাফেলার সাথে শরীক হন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু বকরের (রা.) উপর অমানুষিক নির্যাতন

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে একদিন হযরত আবু বকর (রা.) দারে আরকাম থেকে মসজিদে হারামে যান। সেখানে হঠাৎ হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখা শুরু করেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) দিকে আহ্বান জানান। এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মসজিদে হারামে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। মুশরিকগণ হযরত আবু বকরের (রা.) এ বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পদদলিত করতে থাকে। ওৎবা বিন রাবিয়া তার মুখে জুতা দিয়ে এমনভাবে আঘাতের পর আঘাত করে যে তার মুখমণ্ডল ফুলে যায়। রক্তে নাক ঢেকে যায়। এহেন করুণ অবস্থায় তার গোত্রের (বনু তায়েম) লোক এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। তারা এ ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হয় যে, তিনি মারা যাবেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হযরত আবু বকরকে (রা.) বাড়ী রেখে পুনরায় তার গোত্রের লোকেরা মসজিদে হারামে গিয়ে এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, খোদার কসম! যদি আবু বকর মারা যায় তাহলে আমরা ওৎবাকে জীবিত রাখব না। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.) সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসতেই তিনি জানতে চাইলেন, মুহাম্মদ (সা.) এর অবস্থা কী? কথাটা তার গোত্রের লোকদের পছন্দ না হওয়ায় তারা আবু বকর (রা.) কে গালিগালাজ করল। এর পর তারা চলে গেল। যাবার আগে হযরত আবু বকরের (রা.) মায়ের কাছে তারা বলে গেল তার প্রয়োজনীয় পানাহারের ব্যবস্থা করতে। যখন হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে তার মা ছাড়া আর কেউ রইল না, তখন আবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তার মা বললেন, তোমার বন্ধুর খবর আমার জানা নেই।

তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার মাকে ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের কাছে পাঠালেন রাসূলের (সা.) অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে। ফাতেমা ইসলাম কবুল করেছিলেন, কিন্তু তার মুসলমান হবার কথা তখনও গোপন ছিল। হযরত আবু বকরের (রা.) মা তার কাছে গিয়ে বললেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর খবর জানতে চেয়েছে। উত্তরে ফাতেমা

www.bjilibrary.com

(রা.) বললেন, আমি তো ঐ দু'জনের কাউকে চিনি না। তবে আমাকে আবু বকরের (রা.) কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, আচ্ছা চল। ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা.) আবু বকরের (রা.) বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি আর্তনাদ করে বললেন, খোদার কসম, যারা আপনার সাথে এভাবে দুর্ব্যবহার করেছে তারা নিঃসন্দেহে কাফির এবং ফাসিক। আশা করি আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। হযরত আবু বকর (রা.) ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের (রা.) কাছে জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা কি? ফাতিমা (রা.) চুপে চুপে বললেন, আপনার মা- তো শুনছেন। আবু বকর (রা.) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তার পক্ষ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন উম্মে জামিল ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.) বললেন হুজুর (সা.) পরিপূর্ণভাবে সুস্থ আছেন। এর পর জানতে চাইলেন, তিনি কোথায় আছেন? ফাতিমা (রা.) এর উত্তরে বললেন, তিনি দারে আরকামেই আছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বেশ আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, খোদার কসম! আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। উম্মে জামিল ফাতিমা (রা.) বললেন, একটু ধৈর্য ধরুন। এর পর শহরের অবস্থা শান্ত হলে আবু বকরের (রা.) মা উম্মুল খায়ের ও ফাতিমা (রা.) দু'জনে ধরাধরি করে হযরত আবু বকর (রা.) কে দারে আরকামে নিয়ে গেলেন। আবু বকরের (রা.) অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তাকে চুম্বন করলেন। সেই সাথে উপস্থিত সকলেই তার অবস্থা দেখতে এগিয়ে এলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলে পাক (সা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার বাপ-মা আপনার জন্যে কোরবান হোক। আমার তেমন কোন কষ্ট হয়নি। ঐ পাষণ্ড ওৎবা বিন রাবিয়া তার জুতার আঘাতে যে কষ্ট দিয়েছে ওটাই ছিল বড় কষ্টের ও যন্ত্রণার। এছাড়া আর তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। এরপর তিনি নবী করিম (সা.)-এর সাথে তাঁর মাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আমার মা। আপনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন এবং দো'আ করুন। যেন আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.) তার জন্যে দো'আ করলেন। তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। তিনি সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রহৃত হলেন নির্মমভাবে

একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এ পর্যন্ত কুরাইশগণ আমাদের কাউকে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তাদেরকে কুরআন পাক শুনিয়ে দিতে পারবে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একথা শুনামাত্র বলে উঠলেন, একাজটি আমিই করতে চাই। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অবশ্য বললেন, আমাদের ভয় হয় এমনটি করলে তারা তোমার উপর বাড়াবাড়ি করতে পারে। তারা আরো বললেন, আমাদের মতে এমন এক ব্যক্তিরই এ কাজটা করা উচিৎ যার বংশ এবং পরিবার প্রভাবশালী। কারণ যদি এর প্রতিক্রিয়ায় কুরাইশগণ কোন খারাপ আচরণ করতে উদ্যত হয়, তাহলে তার পরিবারের লোকজন তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এ কাজ আমাকে করতে দাও। আল্লাহ আমার সহায়।

অত:পর একটু বেলা হওয়ার সাথে সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মসজিদুল হারামে পৌঁছেন। ততক্ষণে কুরাইশ সর্দারগণও নিজ নিজ স্থানে বৈঠকে বসা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মাকামে ইব্রাহীমে পৌঁছে উচ্চস্বরে সূরা আর রহমান তিলাওয়াত শুরু করেন। কুরাইশগণ প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করে যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কী পড়ছেন? একটু পরেই তাদের কাছে পরিষ্কার হল, এটা তো সেই কালাম যেটাকে মুহাম্মদ আল্লাহর কালাম হিসেবে পেশ করে থাকেন। তাই সাথে সাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। তার মুখে মারতে থাকল চড়-থাপ্পর। কিন্তু এতে হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বিচলিত বা পিছপা না হয়ে অটল-অবিচলভাবে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন। যতই তারা মারতে থাকে ততই তিনি কুরআন পড়তে থাকেন। যতক্ষণ সাধ্যে কুলায় তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। অবশেষে তিনি ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে যখন ফিরে আসেন তখন তার সাথীরা বললেন, আমরা তো এ ভয়ই করছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই ঘটনায় খোদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বললেন, আজকের দিনে ঐ খোদার দুশমনেরা আমার কাছে যতটা দুর্বল মনে হয়েছে অন্য কোন দিন এত দুর্বল মনে হয়নি। যদি তোমরা বল তা হলে আগামীকাল আবার

www.bjilibrary.com

তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে আসি। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) বললেন, বাস অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই। তারা যা শুনতে চায়নি, তুমি ওদেরকে তা শুনিয়ে দিয়েছ, এটাই যথেষ্ট।

হযরত বেলালের (রা.) উপর নির্যাতন

হযরত বেলাল (রা.) আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রিয় সাহাবীদের একজন। তিনি বেলালে হাবশী (রা.) নামেই অধিকতর পরিচিত। তার পিতা রাবাহ বনি জুমাহার এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। রাবাহ বনি জুমাহার গোলামী অবস্থায় হযরত বেলালের জন্ম হয়। তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা.) সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথেই তার দাওয়াত কবুল করেন। তার ইসলাম কবুলের কথা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহী তার উপর নানাভাবে জুলুম নির্যাতন শুরু করে দেয়। ঐ পাষণ্ড জুমাহী পরিবারের নেতা উমাইয়া বিন খালাফ হযরত বেলালকে (রা.) দুপুর বেলায় প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে মক্কার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিত। এরপর তার উপর চাপা দিয়ে রাখতো ভারী পাথর। এরপর বলতো, খোদার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত-ওজ্জার ইবাদতের ঘোষণা তুমি না দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমাকে এ অবস্থায়ই পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.)-এর জবাবে শুধুমাত্র একটি শব্দই উচ্চারণ করেছেন; আর তাহল আহাদ, আহাদ। ঐতিহাসিক বালাযুরী হযরত আমর বিন আল আসের সূত্র ধরে বলেন, "আমি হযরত বেলালকে এমন উত্তপ্ত মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখেছি, যার ওপর কাঁচা গোশত রেখে দিলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই রান্না হয়ে যেতো। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি স্পষ্ট করে বলতেন, "আমি লাত ও উজ্জাকে অস্বীকার করি"।

হযরত বেলালের (রা.) উপর অমানুষিক নির্যাতনের চোখে দেখা বর্ণনা দিয়েছেন, রাসূলের (সা.) কবি হাসসান বিন ছাবেত (রা.)। আমি হজ্জ অথবা ওমরা উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে দেখলাম, বেলালকে একটি রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছেলে ছোকড়ার দল তাকে নিয়ে রাস্তায় টানা হেঁচড়া করছে। এমতাবস্থায়ও বেলাল একথা বলতে থাকেন আমি লাত, ওজ্জা, হুবল, ইসাফ, নায়েলা এবং বুয়ানা সকলকেই অস্বীকার করি। বালাযুরী এ সম্পর্কে স্বয়ং বেলালের নিজস্ব বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। হযরত বেলাল

www.bjilibrary.com

(রা.) তার নিজের জবানীতে বলেন, "আমাকে একদিন এক রাত পিপাসার্ত রাখা হয়, তারপর উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর নিক্ষেপ করা হয়"। ইবনে সাদের বর্ণনা মতে গলায় রশি বেঁধে তাকে যুবক বালকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হতো। তারা এভাবে তাকে মক্কার বিভিন্ন উপত্যকাগুলোতে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। তারপর উত্তপ্ত বালুর উপর উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তার উপর পাথর চাপা দিত। এ অবস্থাতেও তিনি শুধু বলতে থাকতেন আহাদ, আহাদ।

হযরত আবু বকর (রা.) বনী জুমাহির এলাকায়ই বসবাস করতেন। অতএব হযরত বেলালের (রা.) উপর সংঘটিত এই পৈশাচিক জুলুম অত্যাচার চাক্ষুস দেখার সুযোগ হয় তার। অতিশয় রহম দেল মানুষ হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে এ দৃশ্য ছিল অসহনীয়। তিনি অধীর হয়ে বেলালের (রা.) সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন, তিনি অন্য একজন স্বাস্থ্যবান হাবশী গোলামের বিনিময়ে বেলালকে খরিদ করে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা.) উপর অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী

হযরত আম্মার (রা.)-এর পিতা ইয়াসির ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। সেখান থেকে মক্কায় আসেন। মক্কায় আগমনের পর আবু হুজায়ফা বিন মুগিরা মাখজুমীর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবু হুজায়ফা তার দাসী সুমাইয়ার সাথে ইয়াসির-এর বিয়ে দিয়ে দেন। রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের সাথে সাথে ইয়াসির, সুমাইয়া, আম্মার এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ সবাই মুসলমান হয়ে যান। ফলে গোটা পরিবারকে কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে হয়। ঐতিহাসিকগণ হযরত উম্মে হানী (রা.) ও হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে স্থানে তাদের গোটা পরিবারকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, একদিন সেখান দিয়ে স্বয়ং রাসূল (সা.) যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা দেখে বলে উঠলেন "হে আলে ইয়াসির সবর কর, তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা" হযরত ওসমান (রা.)-এর সূত্রে আরো উল্লেখ আছে "একবার তিনি (হযরত ওসমান) রাসূল পাক (সা.)-এর সাথে ঐ স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে ইয়াসির (রা.) পরিবারকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। হুজুর বললেন, সবর কর!

www.bjilibrary.com

সেই সাথে এই বলে দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ আলে ইয়াসিরকে মাগফেরাত দান কর। আর তুমি তো তাদের মাগফিরাত করেই দিয়েছ।"

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ মুহাম্মদ বিন কায়াব আল কুরাজীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আম্মারকে (রা.) তার জামা খোলা অবস্থায় দেখতে পায় যে, তার সারা পিঠে আগুনে পুড়ে যাওয়ার দাগ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তাকে এসব কি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, এ সব ঐ শাস্তির চিহ্ন, যা মক্কার উত্তপ্ত জমিনে আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

আমর বিন মাইমুনের বরাত দিয়ে ইবনে সা'দ বলেন, মুশরিকদের পক্ষ থেকে হযরত আম্মারকে (রা.) আগুনের জ্বলন্ত অংগার দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। হুজুর এটা দেখে দো'আ করেন, হে আগুন তুমি আম্মারের (রা.) উপর তেমনি শীতল হয়ে যাও যেমনি শীতল হয়ে গিয়েছিলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর। এহেন অমানুষিক অত্যাচারে আম্মারের (রা.) পিতা ইয়াসির (রা.) মৃত্যু বরণ করেন। এরপর আবু জেহেল তার মাতা সুমাইয়া (রা.) হত্যা করে। তার ভাই আব্দুল্লাহকে (রা.) নিহত করা হয়। শুধু হযরত আম্মার (রা.) বেঁচে যান। তাকে যেমন আগুনের অংগার দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয় তেমনি পানিতে ডুবিয়েও দেওয়া হত। এভাবে সীমাহীন অত্যাচারের এক পর্যায়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রা.) ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি জীবন রক্ষার জন্যে নবীকে অস্বীকার করেন এবং তাদের দেব-দেবীর প্রশংসা করতে বাধ্য হন। পরে কান্নাকাটি অবস্থায় অত্যন্ত পেরেশানীর সাথে নবী করিম (সা.)-এর দরবারে এসে হাজির হন এবং সকল ঘটনা খুলে বলেন। রাসূল (সা.) সব শুনার পর জানতে চাইলেন ঐ সময় তার মনের অবস্থা কী ছিল? তিনি বললেন ঈমানের উপরে মনের দিক দিয়ে পুরোপুরিই ঠিক ছিলাম এবং আছি। রাসূল (সা.) বললেন, ভবিষ্যতেও এমন অবস্থায় পড়লে এরূপ ভূমিকাই পালন করবে। বিভিন্ন তাফসিরকারকগণের মতে এই প্রেক্ষিতে সূরায়ে নাহলের ১০৪ নং আয়াত নাজিল হয় যাতে বলা হয়েছে-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফর করল, কিন্তু এ কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, অথচ মন তার ঈমানের উপর নিশ্চিন্ত ছিল, তা হলে তাকে মাফ করা হবে। কিন্তু যে সন্তুষ্ট চিত্তে কুফর অবলম্বন করবে, তার জন্যে আল্লাহর গজব এবং কঠিন শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আন নাহল - ১০৪)

হযরত খাব্বাব বিন আল আরাতের (রা.) উপর জুলুম

হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত (রা.) ছিলেন মূলত ইরাকের অধিবাসী। রাবিয়া গোত্রের একটি দল তাকে ধরে এনে ক্রীতদাস বানায় এবং পরবর্তীতে মক্কায় এনে বনি খোযায়ার একটি পরিবার 'আলে সাবা'র কাছে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাব্বাব পেশাগতভাবে ছিলেন তরবারী নির্মাণ কাজে একজন দক্ষ কারিগর ও কর্মকার। মুসলমান হবার অপরাধে তাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে পথে বসানো হয়। মুসনাদে আহমদ, বোখারী, মোসলেম প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে; হযরত খাব্বাব (রা.) নিজে বলেছেন, "আ'স বিন ওয়ায়েল সাহমীর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তার কাছে এটা চাইতে গেলে সে বলতো মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে তোমাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আমি তার জবাবে বলতাম আমি কখনই তাকে অস্বীকার করব না। তুমি যদি মরে আবার জীবিত হও তবুও না। এর জবাবে আস বলতো ঠিক আছে আমি মরার পর যখন আবার জীবিত হয়ে আমি আমার মাল ও আওলাদের নিকট ফিরে আসব তখন তোমার পাওনা শোধ করব। ইবনে হিশামে ঘটনাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, আস খাব্বাব (রা.) থেকে অনেক তরবারী বানিয়ে নেয় ফলে ঋণ বাড়তে থাকে। খাব্বাব (রা.) উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্যে তাকিদ দিলে সে বলে তুমি যে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছো তিনি তো বলেন জান্নাতে বহু সোনারূপা, কাপড় ও খেদমতগার আছে। খাব্বাব (রা.) বললেন হ্যাঁ সত্য কথা। আস বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। সেখানে আমি ঋণ পরিশোধ করব। কারণ সেখানে তুমি ও তোমার মুহাম্মদ আমার চেয়ে বেশী প্রিয় পাত্র হবে না।

এভাবে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করেও যখন জালেমদের তৃপ্তি হল না তখন তারা তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া শুরু করল। এ প্রসঙ্গে ইবনে সা'দ ও বালাযুরী শা'বীর রেওয়াতের সূত্র ধরে বলেন, একবার হযরত ওমরের

www.bjilibrary.com

(রা.) খেলাফত কালে হযরত খাব্বাব (রা.) তার পিঠ খুলে দেখালেন, যা একেবারে শ্বেতকুষ্ঠ রুগীর মত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, মুশরিকরা আগুন জ্বালিয়ে তার উপর দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতো আর একজন আমার বুকের উপর দাঁড়াতো। এরপর আমার চর্বি গলে আগুন নিভে যেতো। হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত (রা.) এভাবে জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হতে এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) জুলুম তো এখন চরমে পৌঁছে গেছে। আপনি কি আমাদের জন্যে দো'আ করছেন না? এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূলের (রা.) চেহারা লাল হয়ে যায়, তিনি বলেন, তোমাদের আগে যারা ঈমানদার ছিলেন, তাদের উপর এর চেয়েও অনেক বেশী জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে মাটিতে গর্ত খনন করে তাতে বসিয়ে দিয়ে মাথা থেকে করাত চালিয়ে দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হত, কারো শরীরের জোড়ায় জোড়ায়, লোহার চিরুনী দিয়ে মাংস তুলে নেওয়া হত, ঈমান ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে। তথাপি তারা দীন থেকে ফিরে যেতেন না। বিশ্বাস করো আল্লাহ্ একাজকে পরিপূর্ণতা অবশ্যই দান করবেন। অবশেষে এমন একদিন আসবে যখন এক ব্যক্তি 'সান'আ থেকে হাজরা মাউত' পর্যন্ত ভয়-শংকাহীনভাবে সফর করতে পারবে। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় বলতে কিছু থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছো।

এই লোমহর্ষক জুলুম নির্যাতন আর নিপীড়নের কাহিনী অসংখ্য অগণিত। আমরা মাত্র এর একটি ক্ষুদ্র অংশেরই আলোচনা করছি একান্তই প্রতীকি হিসেবে। আমরা মক্কার সেই সময়ে কাফের-মুশরিকদের হাতে জুলুম নির্যাতনের শিকার হিসেবে যে ক'জনের নাম এখানে উল্লেখ করেছি তারা সবাই ছিলেন রাসূল (সা.)-এর একান্তই প্রিয় সাহাবী তথা ঘনিষ্ঠ সাথী-সঙ্গী। তাদের উপরে সংঘটিত এই নিপীড়ন আর নির্যাতনের কাহিনী একদিকে যেমন সে সময়ের কাফের-মুশরিকদের নৃশংসতার লোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরে, তার চেয়ে বেশী করে তুলে ধরে আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথীদের ঈমানের উপরে অটল অবিচল থাকার এক অনন্য সাধারণ

www.bjilibrary.com

বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। আল কুরআনের পরিভাষা সবর ও ইস্তেকামাতের উপরে বাস্তবে আমল করার ক্ষেত্রে তারা রেখে গেছেন জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে দীন কায়েমের আন্দোলনের পতাকাবাহীদের জন্যে এসব কাহিনীর মধ্যে রয়েছে ঈমানের দাবী পূরণে উজ্জীবিত হবার প্রেরণার উৎস। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন ভাগ্যবান সাহাবীর উপর কাফের-মুশরিকদের জুলুম অত্যাচারের আলোচনা করলাম। যার মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) এবং ওসমানের (রা.) মত ধনাঢ্য প্রভাবশালী পরিবারের লোকও ছিলেন আবার বেলাল (রা.), খাব্বাব (রা.) ও আম্মারের (রা.) মত গরীব শ্রেণীর সাহাবীও ছিলেন। এরপরই আমরা স্বয়ং রাসূল (সা.) এর উপর তায়েফের জমিনে যে নির্মম ও জঘন্য অত্যাচার আর নিপীড়ন হয়েছিল সংক্ষেপে সে আলোচনায় আসতে চাই।

www.bjilibrary.com

(৫)

তায়েফে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি নবুওয়াতের দশম বছর ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা.) জন্যে শোকের বছর। এই বছরে তিনি তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক চাচা আবু তালিবকে হারান। অল্প ব্যবধানে হারান তার জীবন সঙ্গিনী সুখে-দুঃখের বিশ্বস্ত সাথী বিবি খাদিজা (রা.)-কে। দু'জন ছিলেন রাসূলের রেসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের অবলম্বন এবং সহায়ক শক্তি। হযরত আবু তালিব জাগতিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে কাফের-মুশরিকদের মুকাবিলায় রাসূলের (সা.) জন্যে ছিলেন একটি বিরাট অবলম্বন। বিবি খাদিজা (রা.) বৈষয়িক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই ছিলেন রাসূলের (সা.) একটি বড় অবলম্বন। এই দু'টো অবলম্বন থেকে বঞ্চিত হবার ফলে মনের উপর বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি হওয়া ছিল একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। তার উপর কাফের-মুশরিকদের বেপরোয়া আচরণ, অসহায় মনে করে জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া ছিল একটা বাড়তি চাপের শামিল। এই পটভূমিতে কুরাইশদের নির্যাতন নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তাদের ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হয়েই আল্লাহর রাসূল (সা.) মক্কা থেকে ৫০ মাইল দূরে তায়েফে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে। কারণ এই সময়ে কুরাইশ সর্দারদের নেতৃত্বে মক্কার কাফের-মুশরিকগণ বাধা প্রতিবন্ধকতার মাত্রা যেভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর করছিল তাতে তারা দাওয়াত কবুল করবে এ আশা করার সুযোগ তো ছিলই না উপরন্তু এ দাওয়াতের কাজ কোন ক্রমেই চলতে দিবে না এটাই অনুমিত হচ্ছিল অবস্থার প্রেক্ষিতে।

www.bjilibrary.com

নবী (সা.)-এর তায়েফ সফরের লক্ষ্য ছিল ওখানকার লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা সেই সাথে তায়েফের প্রভাবশালী শক্তিশালী গোত্র বনী সাকিফকে অন্তত এতটুকুতে রাজী করাবেন যে তারা সেখানে নবীকে (সা.) আশ্রয় দেবে এবং ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। মক্কা থেকে সুদূর তায়েফের এই সফরে রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন জায়েদ ইবনে হারেছা। তিনি এই সফরে বিশ দিন পর্যন্ত তায়েফব-াসীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং আবদে ইয়ালীলের সাথে সাক্ষাতের পর সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন।

তায়েফের নেতৃত্ব ছিল আমর বিন ওমাইর বিন আওফের তিন পুত্র আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবিবের হাতে। এদের কোন একজনের ঘরে কুরাইশ বংশের সুফিয়া বিনতে জুমাহী নাম্নী এক মহিলা ছিল। রাসূল (সা.) তায়েফের এই তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, আমি ইসলামের কাজে আপনাদের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় এখানে এসেছি। সেই সাথে আমার কওমের যারা আমার বিরোধিতা করছে তাদের মোকাবিলায় আমি আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতাও কামনা করি। রাসূলে পাক (সা.) এর বক্তব্য শুনার পর তাদের একজন বললো, আল্লাহ্ যদি তোমাকে নবী বানিয়ে থাকেন তাহলে আমি কাবা ঘরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলবো। অপর একজন ঠাট্টার স্বরে বললো আল্লাহ্ বুঝি তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর জন্যে আর কোন লোক খুঁজে পাননি। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, আমি কিছুতেই তোমার সাথে কথা বলবো না, কারণ যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাক তাহলে আমার মত লোকের পক্ষে তোমার কথার জবাব দেওয়া মানায় না কারণ তুমি তো আমার তুলনায় অনেক মহান। আর যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবি করে থাক, তাহলে তুমি এমন যোগ্য নও যে, তোমার সাথে কথা বলা যায়। তাদের তিনজনের কথার ধরন প্রকৃতি দেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) নিশ্চিত হলেন যে, এদের থেকে ভাল কিছুই আশা করা যায় না। তাই তিনি উঠে পড়লেন। তবে বিদায়ের পূর্বে তিনি তাদের প্রতি একটি অনুরোধ রাখলেন। তাহল তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করছ তাতো করছই কিন্তু তোমরা অন্তত আমার এখানে আসার কথাটা গোপন রাখ, প্রচার কর না।

তাদেরকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করার মূল কারণ ছিল কুরাইশগণ এটা জানলে আরো বেপরোয়া এবং সাহসী হয়ে উঠবে। তাদের বিরোধিতা আরও বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তায়েফের ঐ পাষণ্ড নেতৃবৃন্দ সেই অনুরোধটুকু রাখল না। বরং তাদের সমাজের দুষ্ট ও গুন্ডা প্রকৃতির যুবকদেরকে লেলিয়ে দিল মুহাম্মদ (সা.)-কে উত্ত্যক্ত করার জন্যে। তায়েফের ধুরন্ধর ঐ নেতৃবর্গ এটা ধরে নিয়েছিল যে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুদর্শন চেহারা দেখে, তার মুখের সুন্দর কথা শুনে যুবসমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব সেই পরিস্থিতি যাতে আদৌ সৃষ্টি হতে না পারে এজন্যেই তারা এই নোংরা কৌশল অবলম্বন করে যাতে নবী মুহাম্মদের (সা.) কথা শোনার সুযোগ কারো জন্যেই না হতে পারে।

তায়েফের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির যুবকেরা রাসূলের (সা.) পিছে লাগল। প্রথমে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে থাকল, ঠাট্টা-মশকারা করতে শুরু করল। তাদের হৈ চৈ শুনে লোক জড়ো হতে লাগল এবং আল্লাহর রাসূলকে (সা.) তাড়া করে একটি বাগান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দিল। উক্ত বাগানের মালিক ছিল উতবা বিন রাবিয়া (রা.) ও শায়বা বিন রাবিয়া (রা.)।

রাসূলে পাক (সা.) তার এই তায়েফ সফরকালীন সময়ে বনী সাকিফের দলপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু কেউ তার এ আহ্বানে সাড়া দিল না। মুহাম্মদ (সা.) তাদের যুবকদের বিগড়িয়ে দিতে পারেন, এ আশঙ্কায় তারা বললো, হে মুহাম্মদ (সা.) তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। পৃথিবীর অন্য কোথাও তোমার বন্ধু থাকলে তার সাথে গিয়ে মিলিত হও। অত:পর তারা তাদের ভবঘুরে যুবকদেরকে লেলিয়ে দিল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপরে। তারা চিৎকার করে এবং গালাগালি করে লোক জড়ো করে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঢিল পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দিল। পাষণ্ড ঐ গুন্ডা প্রকৃতির গোলাম ও যুবকেরা তাক করে রাসূলের (সা.) পায়ের গোড়ালী এবং টাকনুতে পাথর মেরে মেরে আল্লাহর রাসূলের (সা.) শরীরকে অসাড় করে তোলে। তারা রাস্তার দু'ধারে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলের (সা.) চলার সাথে সাথে পাথরের পর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। রক্ত ক্ষরণের ফলে রাসূল (সা.) ক্লান্ত হয়ে বসে

www.bjilibrary.com

পড়লে তারা ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার পাথর ছুড়তে শুরু করে। রক্ত ঝরতে ঝরতে এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয় যে জমাট রক্তে রাসূলের পায়ের জুতা আটকে যায় এবং খুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) কিছু সময়ের জন্যে বেহুঁশ হয়েও যান। রাসূলের বিশ্বস্ত সাথী হযরত যায়েদ (রা.) নিজেকে ঢালতুল্য বানিয়ে তাকে হেফাজতের চেষ্টা করেন। পাথরের আঘাতের পর আঘাতে এক পর্যায়ে হযরত যায়েদের (রা.) মাথা ফেটে যায়।

অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সা.) তায়েফ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং ঐসব দুষ্ট গুণ্ডা পাষণ্ড প্রকৃতির লোকেরাও ফিরে গেল। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত নবী মুহাম্মদ (সা.) ওতবা এবং শায়বার আংগুর বাগানের প্রাচীরের গা ঘেঁষে আংগুর লতার ছায়ার নিচে বসে পড়েন এবং তার রবের দিকে মুখ করে এক মর্মস্পর্শী ভাষায় দো'আ করলেন যা সীরাতের বিভিন্ন কিতাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"হে আল্লাহ্ আমি তোমারই দরবারে নিজের অসহায়ত্বের এবং মানুষের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদাহীনতার অভিযোগ পেশ করছি। এ তুমি কার কাছে আমাকে সোপর্দ করছ? এমন অপরিচিত বেগানাদের কাছেই কি আমাকে সোপর্দ করছ যারা আমার সাথে এমন কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করবে। অথবা এমন কার কাছে যাকে তুমি আমার উপর জয় লাভ করার শক্তি দিয়েছ। যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে আমি কোন বিপদের পরোয়া করি না। কিন্তু যদি তোমার পক্ষ থেকে আমি নিরাপত্তা লাভ করি তাহলে তা হবে আমার জন্যে অধিকতর আনন্দদায়ক। আমি পানাহ্ চাই তোমার সত্তার সে নূরের কাছে যা অন্ধকারে আলো দান করে এবং দুনিয়ায় ও আখেরাতের সব কিছু সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে। তোমার গজব ও শাস্তির যোগ্য হওয়া থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন তোমার মর্জির উপর রাজি থাকতে পারি আমাকে সে তাওফিক দাও। আর তুমিও আমার উপর সদা রাজী থাক। তুমি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।"

রহ্মাতুল্লিল আ'লামীন নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর এই মর্মস্পর্শী দো'আ হৃদয় নিংড়ানো আবেগ আপ্লুত কণ্ঠের দো'আ আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়। জালেম তায়েফবাসীর এহেন অপকর্মের জন্যে রাসূল (সা.) চাইলে দুদিক

www.bjilibrary.com

থেকে তাদেরকে পাহাড় চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দিতেও তারা প্রস্তুত বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ফেরেশতা নবী মুহাম্মদকে (সা.) এই মর্মে অবহিত করেন। বোখারী, মোসলেম ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশার (রা.) বরাত দিয়ে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে;

হযরত আয়েশা (রা.) হুজুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ওহুদের যুদ্ধের চেয়েও কি কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন আপনি কখনও হয়েছেন? জবাবে রাসূল (সা.) তায়েফের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি (তায়েফবাসীর নির্মম অত্যাচারের ফলে) এতটাই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম যে কোন দিকে যাব ঠিক পাচ্ছিলাম না। তাই যে দিকে তাকাতাম সেদিকেই ধাবিত হতাম। এ অবস্থা থেকে আমি রেহাই না পেতেই হঠাৎ দেখলাম যে, আমি 'কারনোস সায়ালেব' নামক স্থানে আছি। উপরে তাকিয়ে দেখি একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়া দান করছে। উক্ত মেঘ খণ্ডের মধ্যে হযরত জিব্রাইলকে (আ.) দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা কিছু বলেছে, আপনার দাওয়াতের জবাব তারা যেভাবে দিয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তা সবই অবগত আছেন। তিনি আপনার জন্যে পাহাড় সমূহের ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়েছেন, আপনি আপনার ইচ্ছামত যেকোন হুকুম তাদের করতে পারেন। অত:পর পাহাড়ের ফেরেশতাগণ আমাকে সালাম করে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার কওমের বক্তব্য এবং আপনার দাওয়াতের জবাব কিভাবে তারা দিয়েছে আল্লাহ্ তা শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা, আপনার রব আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি আমাকে হুকুম করেন। বোখারীতে কথাটি এভাবে এসেছে, হে মুহাম্মদ আপনি যা কিছু চান বলার এখতিয়ার আপনার আছে। আপনি চাইলে তাদের উপর মক্কার দুদিকের পাহাড় একত্র করে চাপিয়ে দিব। নবী (সা.)-এর জবাবে বলেন না-না। আমি আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা তাদের বংশে এমন লোক পয়দা করবেন যারা লা শরীক এক আল্লাহর দাসত্ব করবে।

একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছি হুজুর (সা.) ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ওতবা বিন রাবিয়া এবং শায়বার আংগুরের বাগানের প্রাচীর সংলগ্ন আংগুর লতার ছায়ার নিচে বসেছিলেন। তখন তায়েফের দুই সর্দার ঐ বাগানে রাসূল

www.bjilibrary.com

(সা.) এ অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাদের মনে হুজুরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। এখানে একথারও উল্লেখ আছে যে, বনী জুহামের যে মহিলাটি তায়েফের জনৈক সর্দারের বাড়ীতে ছিল সেও হুজুরের সাথে দেখা করে। নবী করিম (সা.) তাকে বললেন, তোমার শ্বশুর কুলের লোকেরা আমার সাথে এ কী আচরণ করল? ওতবা বিন রাবিয়া ও শায়বা ইতোমধ্যে তাদের এক ঈসায়ী গোলামের মাধ্যমে রাসূলের (সা.) জন্যে একটি বড় পাত্রে করে কয়েক গোছা আংগুর পাঠালো এবং মুহাম্মদকে (সা.) তা খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে বলল। ঐ গোলামটির নাম ছিল আদ্দাস। সে রাসূলকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলল, খোদার কসম এদেশে তো এ কালেমা বলার কেউ নেই। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? সে বলল, আমি ঈসায়ী এবং নিনাওয়ার অধিবাসী। এরপর রাসূল (সা.) তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, তুমি কি মর্দে সালেহ ইউনুস বিন মাত্তার বস্তির লোক? আদ্দাস বলল, আপনি তাকে কিভাবে জানেন? হুজুর (সা.) উত্তরে বললেন, তিনি তো আমার ভাই, তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী। একথা শুনামাত্র আদ্দাস- নবী করিম (সা.)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তার হাত, পা, মাথায় চুমু দিতে লাগল এবং কালেমায় শাহাদাত উচ্চারণ করে ঈমানের ঘোষণা দিল।

দূর থেকে রাবিয়ার (রা.) পুত্রদ্বয় ওতবা ও শায়বা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে এবং একে অপরকে বলতে থাকে দেখ তোমাদের নিজস্ব গোলামকেও এ লোকটি বিগড়ে দিল। আদ্দাস নবী (সা.)-এর নিকট থেকে ফিরে আসার পর তাকে বলা হল, তোমার কি হল যে তার মাথা ও হাত পায়ে চুমু দিতে লাগলে? সে তার মালিকদেরকে সম্বোধন করে বলল, প্রভু আমার! তার চেয়ে ভাল মানুষ এই পৃথিবীতে আর নেই। তিনি আমাকে এমন এক বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যা নবী ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না, জানার কথা নয়। তারা তাদের গোলাম আদ্দাসকে বলল, তোমার দীন থেকে ফিরে যেয়ো না। তার দীন থেকে তোমার দীন উত্তম। তায়েফে আল্লাহর রাসূল (সা.) এসেছিলেন মক্কাবাসীর ব্যাপারে হতাশ হয়ে। কিন্তু সেই তায়েফের লোকেরা তার সাথে যে ব্যবহার করল তার কিঞ্চিত বর্ণনা একটু আগেই আমরা করেছি যা আল্লাহর রাসূলের (সা.) নিজের জবানীতে, ওহুদের চেয়েও ভয়াবহ। এরপর রাসূলের (সা.) সামনে তার নিজের

www.bjilibrary.com

জন্মস্থান মক্কায় ফিরে আসার কোন বিকল্প ছিল না। কিন্তু কিভাবে ফিরে যাবেন সে বিষয়ে তাকে ভাবতে হয়েছে, অনেকবার। তিনি তায়েফ থেকে ফেরার পথে নাখলা নামক স্থানে কিছু দিন অবস্থান করেন। মক্কায় কি করে, কিভাবে ফিরে যাবেন এনিয়ে রাসূলের (সা.) মনে ছিল দারুণ পেরেশানী। কারণ তায়েফের ঘটনা মক্কাবাসীর কাছে পৌছার পর তাদের সাহস আরো বেড়ে যাওয়ার কথা। এই পেরেশানীসহ আল্লাহর রাসূল (সা.) মক্কায় ফিরে যাওয়ার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল (সা.) নামাজরত অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এ সময়ে জ্বীনদের একটি দল এ দিক দিয়ে আসার পথে রাসূলের (সা.) কণ্ঠের এই তেলাওয়াত শুনে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান আনে এবং নিজেদের কওমের কাছে গিয়ে এর দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার নবীকে এই খবরটি প্রদান করেন অহির মাধ্যমে। যার লক্ষ্য ছিল রাসূলের (সা.) মনে সান্ত্বনা প্রদান করা। মানুষ নবীর এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেও জ্বীনদের একটি অংশ এ দাওয়াত কবুল করে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে এটা প্রচার করাও শুরু করে দেয়।

নাখলায় অবস্থানকালে আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন তার সফর সঙ্গী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কিভাবে মক্কায় ফিরে যাবেন, তারা তো আপনাকে সেখান থেকে বের করেই দিয়েছে। রাসূল (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যে অবস্থা দেখছো আল্লাহ এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তিনিই তো তার দীনের সহায় ও তার নবীকে বিজয়ী করতে সক্ষম। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.) মক্কায় ফিরে যাবার কৌশল নির্ধারণের চিন্তা ভাবনা করেন।

হেরায় পৌছার পর তিনি আবদুল্লাহ বিন আল ওরায়কেতকে পর পর তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে পাঠান তাদের আশ্রয় এবং সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়ার জন্যে। প্রথমে আবদুল্লাহ বিন পাঠান হল আখনাস বিন শুরায়েকের নিকট যেন সে রাসূলকে (সা.) আশ্রয় প্রদান করে। আখনাস বিন শুরায়েক বলল, সে কুরাইশদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকার কারণে আশ্রয় দিতে পারবে না। অত:পর হুজুর আবদুল্লাহ বিন ওরায়কেতকে সুহাইল বিন আমরের নিকট পাঠান। তার পক্ষ থেকে বলা

হল বনি আমর বিন লুসাই বনি কা'বের মোকাবিলায় তো কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর রাসূল (সা.) বনি আবদে মানাফের একটি শাখা বনি নওফেলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুতয়েম বিন আদির নিকট আবদুল্লাহ্ বিন ওরায়কেত পাঠালেন।

আমাদের মনে থাকার কথা কুরাইশের যে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শিআবে আবি তালিবের বন্দী জীবনের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে মুতয়েম বিন আদি তাদেরই একজন। আবদুল্লাহ্ বিন ওরায়কেত তার নিকট গিয়ে বললেন, মুহাম্মদ (সা.) তোমার কাছে জানতে চেয়েছেন, তুমি কি তাকে আশ্রয় দিতে রাজী আছ যাতে তিনি তার রবের পয়গাম পৌঁছাতে পারেন। জবাবে মুতয়েম বিন আদি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে বলল, তাকে মক্কায় আসতে বল। অতএব রাসূল (সা.) শহরে গিয়ে বাড়ীতেই রাত কাটালেন। সকালে মুতয়েম তার পুত্রদেরকে অস্ত্র সজ্জিত করে হুজুরকে (সা.) হারাম শরীফে নিয়ে যায় এবং হুজুরকে (সা.) তাওয়াফ করার জন্যে অনুরোধ করে। হুজুরের (সা.) তওয়াফের সময় মুতয়েম ও তার পুত্রগণ তার নিরাপত্তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। এ অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ বিন মুতায়েম (রা.) ও তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আশ্রয়দাতা না তার আনুগত্যকারী? মুতয়েম বলল, না, শুধু আশ্রয় দানকারী। অত:পর আবু সুফিয়ান (রা.) বলল, তোমাদের আশ্রয় ভংগ করা যায় না, তোমরা যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

মুতয়েম বিন আদির এই বদান্যতা আল্লাহর রাসূল (সা.) মনে রেখেছিলেন। তাই বদর যুদ্ধ শেষে বন্দীদের ব্যাপারে বলেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতয়েম (রা.) যদি বেঁচে থাকত আর এই লোকদের জন্যে সুপারিশ করত, তাহলে আমি এদেরকে ছেড়ে দিতাম। মুতয়েম বিন আদি (রা.) সম্পর্কে আরো জানা যায়, রাসূল (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) দু'জনের কাছে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। সেই বিশ্বাসেই হযরত নবী করিম (সা.) মক্কায় ফিরে যাবার জন্যে যে তিনজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন, তার মধ্যে মুতয়েম বিন আদিও শামিল ছিল। অন্য দু'জন তাদের চুক্তিবদ্ধতার কারণে রাজী হতে পারেনি। কিন্তু মুতয়েম বিন আদি রাজী হয়ে যান।

www.bjilibrary.com

এখানে লক্ষণীয় মক্কার পরিস্থিতিকে চরম প্রতিকূল মনে করে রাসূল (সা.) তায়েফ গেলেন। তায়েফের জমিনে পাষাণ দুর্বৃত্তদের চরম দুর্ব্যবহার ও নির্মম জুলুম নির্যাতনের মুখে আবার মক্কায় ফিরে আসার জন্যে যে কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত।

এখানে একদিকে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও ভরসা, যে তিনি তার দীনের বিজয়ের পথ সুগম করবেনই; চরম প্রতিকূলতাকে তিনি অবশ্যই অনুকূল বানাতে সক্ষম। এ আস্থা এ ভরসাই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। সেই সাথে ঈমান না আনলেও কিছু মানুষের মনে সত্যের স্বীকৃতি থাকতে পারে, সত্যের পথিকদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এ সাহায্য সহযোগিতা আদায় করে নেওয়ার মত কর্মকৌশল উদ্ভাবনে দায়ীকে অবশ্যই বাস্তবসম্মত চেষ্টা তদবির করতে হবে। প্রান্তিক চিন্তা বা চরমপন্থার স্থান যেহেতু ইসলামে নেই, এজন্যেই সর্বশেষ নবীর (সা.) মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সংলাপ, সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা গ্রহণের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার ক্ষেত্রে গৃহীত এই কর্মকৌশলের মাধ্যমে।

www.bjilibrary.com

(৬)

মে'রাজ ঃ উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

মক্কাবাসীর ব্যাপারে হতাশ হয়ে নবুওয়াতের দশম বছরে রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং মক্কার কোরাইশদের মোকাবিলায় সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া। তায়েফবাসীও অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করল তার দাওয়াত ও নবুওয়াতকে। শুধু প্রত্যাখ্যানই করল না। তার ওপরে এমন অমানুষিক ও পৈশাচিক জুলুম নির্যাতন চালান যা নজীরবিহীন। নবী মুহাম্মদ (সা.) অবশেষে তায়েফবাসী থেকেও হতাশ হয়ে ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমিতে। মক্কার কোরাইশ নেতৃবৃন্দ এটা জেনে আরো বেপরোয়া হয়ে রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করল যে, মুহাম্মদ (সা.) তায়েফে গিয়ে শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয়নি, তিনি সেখানে নজীরবিহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) মুতয়েম বিন আদির আশ্রয়ে ও নিরাপত্তায় থাকার কারণে কিছুটা নিরাপদ বসবাসের সুযোগ পেলেও আবু জাহেল, আবু লাহাব ও তার অনুচরদের বিরোধিতা থেমে যায়নি। নবুওয়াতের দশম বছরের শেষ সময়কাল থেকে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত তিনটি বছর ছিল নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাথীদের (রা.) জন্যে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়।

জাগতিক বা বস্তুগত দৃষ্টিকোন থেকে রাসূলের (সা.) এই আন্দোলনের সাফল্যের ন্যূনতম কোন সম্ভাবনাও ছিল কল্পনার বাইরে। এমতাবস্থায় নবী মুহাম্মদ (সা.) নতুন আঙ্গিকে দাওয়াতের সূচনা করলেন হজ্জ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন মেলাকে কেন্দ্র করে। হজ্জের মৌসুমে এটা শুরু করলেও এ ধারা চালু রাখতেন বছর ব্যাপী। এর মাধ্যমে আরবের প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী গোত্রসমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করে তাদের কাছে তার নবুওয়াতের পরিচিতি তুলে ধরেন, তাদেরকে আল্লাহর দীন

www.bjilibrary.com

কবুলের দাওয়াত পেশ করেন এবং এই কাজ করার জন্যে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তাদের কওমের কাছে রাসূল (সা.) কে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। দাওয়াতের এই ধারাবাহিক কার্যক্রম চলতে থাকে হিজরাতের চূড়ান্ত নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত। আল্লাহর রাসূলের এই আহবানে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে তেমন কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া না গেলেও রাসূলের (সা.) রেসালাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সর্বত্রই। প্রায় সব গোত্রের মধ্য থেকে কম বেশী দুই চারজন লোক ইসলাম কবুল করে এবং মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীদের মধ্যে শামিল হয়। মক্কা নগরীতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমানের দাবী পূরণে চরম ঝুকি নিতে ছিল সদা প্রস্তুত। ইতোমধ্যে মদিনার আওস, খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অনেকেই ঈমানের আলোকে আলোকিত হয় রাসূলের (সা.) হজ্জ্ব মৌসুমে পরিচালিত দাওয়াতী অভিযানের ফলে।

হিজরাত পর্যন্ত রাসূলের (সা.) এই নতুন প্রেক্ষাপটের দাওয়াতী তৎপরতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব না হলেও আমরা মোটামুটিভাবে বিষয়টি উপলব্ধির চেষ্টও করব। তার আগে আমরা আলোচনা করতে চাই মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে পরিচিত মি'রাজ সম্পর্কে। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি। মে'রাজের এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে আগের ও পরের দুটো অবস্থাকে সামনে রেখে বোঝার চেষ্টা করলেই এর গুঢ় রহস্য ও তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন ও উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মে'রাজের আগের অবস্থা আমাদের এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে পরিষ্কার। রাসূল (সা.) মক্কাবাসী থেকে সাড়া তো পানইনি। বরং পেয়েছেন কঠোর বিরোধিতা ও বাধা প্রতিবন্ধকতা। এখান থেকে তায়েফে গিয়েও মুখোমুখী হলেন একই অবস্থার। মক্কায় ফিরে এসে হজ্জ উপলক্ষ্যে আগত বিভিন্ন গোত্রের কাছ থেকেও তেমন কোন ইতিবাচক সাড়া পেলেন না। এই অবস্থা নি:সন্দেহে হতাশা নিরাশার কারণ ঘটায়। মক্কায় রাসূল (সা.) ও তার সাথী-সঙ্গীদের অবস্থান করা হয়ে ওঠে অসম্ভব ও দু:সহ ব্যাপার। তাই রাসূলের (সা.) কিছু সাথী-সঙ্গীদের শুরু হয় মক্কা ত্যাগের পালা। চিত্রের

www.bjilibrary.com

অপর দিকটি হল, মক্কা থেকে দূরে মদিনায় শুরু হতে থাকে রাসূলের (সা.) দাওয়াত কবুলের অনুকূল পরিবেশ। মক্কায় চরম প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদের মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে আল্লাহর দীন নবী মুহাম্মদের (সা.) নেতৃত্বে বিজয়ী হওয়াই ছিল কুদরতের ফায়সালা। সেই বিজয়ের আগে যে ঘটনাটি ছিল একান্তই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য, সেটিই সংঘটিত হল হিজরাতের এক বছর আগে, যা মে'রাজুন্নবী হিসেবে পরিচিত। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) শুধু নবী নন, নবীদেরও নেতা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। তাই তার রেসালাতের বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ্ প্রদত্ত সনদ প্রাপ্তির এটাই ছিল তার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ উপহার। মে'রাজুন্নবীর ওপর আমরা কোন গবেষণাধর্মী আলোচনায় যাবনা। নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রদর্শিত পথে আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনের একজন মাঠকর্মী হিসেবে এ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য, সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা মে'রাজের আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্‌শাল্লাহ।

মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে তাঁর মাধ্যমে দীনের পরিপূর্ণতা বিধান ছিল আল্লাহ্ তায়ালার মহাপরিকল্পনা। দীনের শুধু প্রচার নয়, দীনকে বিজয়ী করা, কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করা ও রাখার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, সবটাই ছিল মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহা পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। এই দীন যাদের হাতে বিজয়ী হবে বা হয়, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পালন করতে হয় একটি পবিত্র আমানত সংরক্ষণের কঠিন দায়িত্ব। যার অনিবার্য দাবী হল কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তার কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে মানবসমাজে ন্যায়-ইনসাফ, শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এতবড় দায়িত্ব আনজাম দেওয়া কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় চূড়ান্তরূপে উত্তীর্ণ হয়। হযরত ইব্রাহী কে (আ.) মানবজাতির ইমামের মর্যাদা প্রদানের আগে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে কঠিনতম পরীক্ষায় ফেলেছেন, আর ইব্রাহীম (আ.) প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। এর পরই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে,

www.bjilibrary.com

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

"আমি তোমাকে মানবজাতির জন্যে ইমাম বানিয়েছি।"

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষার এই স্তরে, এই পর্যায়ে বস্তুজগতের কোন কিছুর ওপরই দায়ীর কোন আশা ভরসার সুযোগ থাকে না। সুযোগ থাকে না এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ওপর ভরসা করার, আস্থা রাখার। নবী মুহাম্মদ (সা.) তার মক্কার জীবনের এমনি একটি পর্যায় যখন অতিক্রম করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তাকে নিয়ে যান জড়জগতের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধালোকে তার কুদরাতে কামেলার কেন্দ্রবিন্দুতে। তৌহিদের নিদর্শনাবলীর তথা আল্লাহর আয়াতসমূহের চাক্ষুষ অবলোকের জন্যে। সমস্ত নবী রাসূলের দাওয়াতের মৌলিক বিষয় ছিল তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আনা, যার অনিবার্য দাবী মানুষের মনমগজ ও চরিত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করে। বিপ্লবী পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয় ভোগবাদী জড়বাদী সভ্যতা ও জীবন ধারায়।

তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের মত এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর তৌহিদ মেনে নেওয়া। তৌহিদের সঠিক পরিচয়ের জন্যেই রেসালাতের ব্যবস্থা। তৌহিদের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে আখেরাতে চূড়ান্ত বিচারের মাধ্যমে। অতএব এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের মূল তৌহিদই। এই তৌহিদের ব্যাপারে সম্যক উপলব্ধির জন্যেই আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি লোকের রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনার আহবান জানিয়েছেন, এই সৃষ্টিলোকের ওপর যে নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এর চাক্ষুষ ও বাস্তব ধারণা লাভের সুযোগ করে দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার প্রিয় নবীকে মে'রাজের মাধ্যমে ঊর্ধলোকের সফরের ব্যবস্থা করে।

গোটা বিশ্বলোকের সকল কিছুর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত এক আল্লাহর। তার এই ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। অতএব তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই দীনের বিজয় ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই এই আস্থা, এই বিশ্বাস মজবুত ও সুদৃঢ় করাই মে'রাজের মূল লক্ষ্য। সেই

www.bjilibrary.com

সাথে রেসালাতের সেলসেলার শেষ হচ্ছে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে, অতএব এই পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই সফরের কর্মসূচির মাধ্যমে। মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী এবং নবীদের নেতা এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বায়তুল মাক্দাসে বা মসজিদে আকসায় তার ইমামতিতে সমস্ত নবীদের নামাজেরও আয়োজন করা হয় এ সফরে। বেহেশত দোজখের দৃশ্য দেখানো হয় প্রতীকিভাবে আখিরাত বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণেরও একিন সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে। মে'রাজের মূল ঘটনা মোটামুটি সকলের জানা বিষয়। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের একটি শুভ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলকে গভীর রাতে তার বাস-ভবন থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মসজিদুল হারামে। জিব্রাইল আমীন (আ.) নিয়োজিত ছিলেন এ সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায়। মসজিদে হারাম থেকে বোরাক নামক যানবাহনে করে নবী মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে যাওয়া হয় মসজিদে আকসায়। সেখানে তার ইমামতিতে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তিনি সর্বশেষ নবী এবং সকল নবীদের নেতা। এরপর এখান থেকে একটি কুদরতি সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জড়-জগতের সীমা পেড়িয়ে উর্ধ্বলোকে তিনি পৌঁছে যান আল্লাহর কারখানায়ে কুদরতের নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুশাহাদা (অবলোকন) করেন আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির যাবতীয় নিদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। ধন্য হন মহান মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে। প্রাপ্ত হন রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে রহমাতুল্লিল আ'লামীন হিসেবে দায়িত্ব পালনের বাস্তবসম্মত নির্দেশিকা।

মে'রাজের এই সফরে হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে হযরত মুসা (আ.) পর্যন্ত বিভিন্ন নবী রাসূলের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের পর এখানে মানুষের দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের ফলকে কিভাবে ভোগ করছে (ভবিষ্যতে করবে) প্রতীকিভাবে তা দেখানো হয়। রাসূল (সা.) দেখতে পেলেন হযরত আদমকে ঘিরে আছে অনেক লোক। তিনি ডানে তাকালে হাসছেন আর বামে তাকালে কাঁদছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে জানতে চাইলে, বলা হল এরা সবাই আদমের বংশধর। আদম (আ.) তার নেক বংশধরদের দেখলে হাসতেন আর অসৎ বংশধরদের দেখলে কাঁদতেন। এর পর নবী (সা.) কে

www.bjilibrary.com

বিস্তারিত দেখার জন্যে সুযোগ করে দেওয়া হয়। এক স্থানে তিনি দেখলেন কিছু লোক ফসল কাটছে, যত কাটছে ততই বাড়ছে। এরা কারা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হল এরা আল্লাহর পথে জিহাদকারী। এরপর দেখলেন কিছু লোকের মাথা পাথর মেরে চুর্ণ করা হচ্ছে। এদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হল এরা ঐসব লোক যাদের অনিহা ও অসন্তোষ তাদেরকে নামাজের জন্যে উঠতে দিত না। এর পর তিনি এমন কিছু লোক দেখতে পেলেন যাদের কাপড়ের আগে পিঁছে তালি দেওয়া। আর তারা পশুর মত ঘাস খাচ্ছে। এদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হল, এরা তাদের মালের জাকাত আদায় করত না, দান খয়রাতও করত না।

এরপর তিনি এমন একজন লোক দেখলেন যে ব্যক্তি কাঠ জমা করে বোঝা হিসাবে উঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আরো বেশী কাঠ তার বোঝার সাথে যোগ করছে। এই লোকটির পরিচয় জানতে চেয়ে উত্তর পেলেন, এ ব্যক্তিটির ওপরে এতবেশী দায়িত্বের বোঝা ছিল যে, সে বহন করতে পারতো না। তা সত্ত্বেও বোঝা কমানোর পরিবর্তে আরো অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিত।

এর পরের দৃশ্যে তিনি দেখলেন, কিছু লোকের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হল, এরা ছিল কান্ডজ্ঞানহীন বক্তা। মুখে যা আসে তাই বলতো এবং সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করতো। তারপর একস্থানে একটি পাথর দেখা গেল, যার মধ্যে ছিল সামান্য ফাটল। তার মধ্য থেকে একটা মোটাসোটা বলদ বেরিয়ে এলো। পরে এর মধ্যে ঢুকতে চেয়ে পারল না। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বলা হল, এটা হল এমন দায়িত্বহীন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ফেৎনা সৃষ্টি করার মত উক্তি করে লজ্জিত হয়ে প্রতিকার করতে চায়, কিন্তু পারে না।

এক স্থানে রাসূল (সা.) দেখলেন, কিছু লোক তাদের নিজেদের গোশত কেটেকেটে খাচ্ছে। তাদের পরিচয় বলা হল, এরা অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ ও কটুক্তি করতো। তাদের পাশেই এমন কিছু লোক ছিল, যাদের হাতের নখ ছিল তামার তৈরী। তাই দিয়ে তারা তাদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। এদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হল, এরা মানুষের অসাক্ষাতে তাদের নিন্দা চর্চা করতো। তাদের সম্মানে আঘাত করতো। কিছু লোকের

www.bjilibrary.com

ঠোট দেখা গেল উঠের ঠোটের মত এবং তারা আগুন খাচ্ছে। তাদের সম্পর্কে বলা হল, এরা ইয়াতিমের মাল সম্পদ ভক্ষণ করতো।

এরপর রাসূল (সা.) এমন কিছু লোক দেখতে পেলেন, যাদের পেট ছিল অসম্ভব বড়ো এবং বিষাক্ত সাপে পরিপূর্ণ। লোকজন তাদেরকে দলিত মথিত করে তাদের ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। কিন্তু তারা কিছু করতে পারছে না। এদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হল এরা ছিল সুদখোর।

এরপর আল্লাহর নবী এমন কিছু লোক দেখলেন, যাদের একদিকে রাখা ছিল ভাল গোশত। অপর দিকে রাখাছিল পচা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত। তারা ভাল গোশত রেখে পচা গোশত খাচ্ছিল। বলা হল, এরা ছিল এমন লোক যারা নিজেদের হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে যৌন বাসনা চরিতার্থ করতো। সেই সাথে এমন কিছু স্ত্রী লোক দেখলেন যারা তাদের স্তনের সাহায্যে লটকে ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হল এরা ছিল এমন স্ত্রী লোক, যারা তাদের স্বামীর ঔরসজাত নয় এমন সন্তানকেও স্বামীর ঔরসজাত হিসেবে দাবী করতো।

এইসব দৃশাবলী পর্যবেক্ষণকালে নবী (সা.) এর সাক্ষাৎ হয় এমন এক ফেরেশতার সাথে যাকে রুক্ষ এবং কাটখোট্টা মেজাজের মনে হচ্ছিল। নবী (সা.) জিব্রাইলকে (আ.) জিজ্ঞেস করলেন এতক্ষণ যত ফেরেশতার সাথে দেখা হল, সবাইকে তো খোশ মেজাজে দেখলাম। ইনি এমন কেন? জিব্রাইল (আ.) বললেন এর হাসিখুশির কোন কারবার নেই। এ যে জাহান্নামের দারোগা। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) জাহান্নাম দেখতে চাইলেন, তাৎক্ষণিকভাবে তার দৃষ্টির পথ থেকে পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হল এবং দোজখ তার ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হল।

এর পর আল্লাহর রাসূল (সা.) এক এক করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ শেষ করেন। এখানে পর্যায়ক্রমে হযরত ইয়াহইয়া, হযরত ইসা (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত হারুন (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সাক্ষাৎপান বিরাট প্রাসাদ বায়তুল মামুরের। সেখানে সকল ফেরেশতাদের যাতায়াত চলছিল।

www.bjilibrary.com

এরপর রাসূল (সা.) এর যাত্রা শুরু হয় আরো অতিরিক্ত উর্ধ্বালোকে। তিনি পৌঁছে যান সিদরাতুল মুন্‌তাহায়। এটি হচ্ছে মহান রাব্বুল ইজ্জাতের দরবার ও জড়জগতের মধ্যবর্তী একটি স্থান। যাকে আমরা উর্ধ্বালোক ও জড়জগতের মাঝে বিভক্তকারী সীমান্ত এলাকা হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। এখানে সকল সৃষ্টির জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। এরপর যা কিছু আছে তা সবই অদৃশ্য। যার জ্ঞান না কোন নবীর আছে না কোন নিকটবর্তী ফেরেশতার। অবশ্যই আল্লাহ যদি তার নিকট থেকে কাউকে বিশেষ কিছু জ্ঞান দিতে চান সেটা ভিন্ন কথা, একান্তই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম মর্যাদাই পেলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)। এই স্থান থেকে রাসূলকে (সা.) বেহেশত পর্যবেক্ষণ করানো হয়। তিনি দেখতে পান এখানে আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্যে রয়েছে এমন সব নেয়ামতের ব্যবস্থা যা কোন দিন মানুষের কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি। কোন মানুষের মন তা কল্পনাও করতে পারেনি।

সিদরাতুল মুনতাহায় জিব্রাইল (আ.) থেকে যান। এরপর নবী (সা.) একটু সামনে অগ্রসর হন, অত:পর এক সুউচ্চ অথচ অনুকূল সমতল স্থানে রাসূল (সা.) দেখতে পান মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবার তার সামনে। এখানেই তাঁকে দান করা হয় কথোপকথনের মর্যাদা। এই মুহূর্তে যা কিছু নির্দেশনা পান তা ছিল নিম্নরূপ:

১। প্রতিদিনের জন্যে ফরজ নামাজ

২। সূরায়ে বাকারার শেষ দু' আয়াতের শিক্ষা

৩। শিরক ব্যতীত সব গোনাহ মাফের আশ্বাস

৪। যে ব্যক্তি একটি নেক কাজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তার জন্যে একটি নেকি লেখা হয়। আর যখন এর ওপর আমল করে তখন দশটি নেকি লেখা হয়। কিন্তু যে অসৎ কাজের ইচ্ছা করে তার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয়না। তবে যখন সে এর ওপর আমল করে তখন তার আমলনামায় মাত্র একটি গোনাহ লেখা হয়।

ফেরার পথে রাসূল (সা.) সেই সিঁড়ি বেয়ে মসজিদে আকসায় অবতরণ করেন। এখানে পুনরায় সব নবীদের উপস্থিতিতে নামাজে শরীক হন এবং ইমামতি করেন। সম্ভবত: এটা ছিল ফজরের নামাজ। অত:পর বোরাকে আরোহন করে ফিরে আসেন মক্কায়।

www.bjilibrary.com

মে'রাজের সফর থেকে ফিরে আসার পর ভোরে সবার আগে রাসূল (সা.) এ বিষয়ে অবহিত করলেন উম্মে হানীকে (রা.)। এর পর নবী মুহাম্মদ (সা.) যখন বাইরে রওয়ানা করেন তখন উম্মে হানী (রা.) তাকে অনুরোধ করে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এ ঘটনাটি কারও কাছে বলবেন না। এতে করে আবার তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করার একটা হেতু পেয়ে যাবে। "আমি এ কথা অবশ্যই বলব" বলে রাসূল (সা.) বেরিয়ে গেলেন। মসজিদে হারামে পৌঁছতেই সামনে পরে যায় আবু জাহেল, সে বলে উঠলো- নতুন কোন খবর আছে কি? হুজুর জবাবে বললেন হ্যাঁ আছে। আমি আজ রাতে বায়তুল মাকদাস গিয়েছিলাম। আবু জাহেল বিদ্রূপের স্বরে বলল, বায়তুল মাকদাস? রাতারাতিই ঘুরে এলে? আর সাত সকালেই এখানে হাজির? হুজুর বললেন, হ্যাঁ তাই। আবু জাহেল বলল, তাহলে লোকজন জমা করি! সকলের সামনে বলবে তো? হুজুর বললেন, অবশ্যই।

এরপর আবু জাহেল চিৎকার করে লোকজন জমা করে হুজুরকে বলল এবার তুমি তোমার কথা বল। হুজুর পুরো ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরলেন। লোকেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা শুরু করে দিল। কেউ হাত তালি দিল। কেউ অবাক বিস্ময়ে মাথায় হাত রাখল, বলল, দু'মাসের সফর মাত্র এক রাতে? অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। আগে কেবল সন্দেহ ছিল, এখন দৃঢ় বিশ্বাস হল তুমি পাগলই বটে। (আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনা, মাসনাদে আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে।)

মে'রাজের এই ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মক্কা শহরে। কাফের মুশরিকদের ঠাট্টা মশকারার পাশাপাশি কিছু মুসলমানদের মনেও সৃষ্টি হয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের। মুসনাদে আহমদ, বোখারী, তিরমিযি, বায়হাকী ও নাসায়ী হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা মতে কিছু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করে। এ অবস্থায় কাফের মুশরিকদের কেউ কেউ বলে যায় হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট এই আশায় যে, মুহাম্মদ (সা.) অতি ঘনিষ্ট ও বিশস্ত সাথী যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) এ ঘটনা শোনার পর বলেন, যদি মুহাম্মদ (সা.) এ কথা বলেই থাকেন, তা হলে তা অবশ্যই সত্য হবে। এতে আশ্চর্যের কি আছে ? আমি তো প্রতি দিন শুনি তার কাছে আসমান থেকে বার্তা আসে। সে সবের সত্যতাও তো আমি স্বীকার করি।

www.bjilibrary.com

অত:পর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদুল হারামে কা'বা বায়তুল্লাহর সন্নিকটে যান, যেখানে আল্লাহর রাসূল (সা.) উপস্থিত ছিলেন। ঠাট্টা বিদ্রূপেরত জনতার ভিড়ও ছিল সেখানে। তিনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি আপনি এসব বলেছেন? হযরত আবু বকর (রা.) আরো বললেন, বায়তুল মাকদাস আমার দেখা আছে আপনি সেখানকার চিত্র বর্ণনা করুন। হুজুর তাৎক্ষণিকভাবে বায়তুল মাকদাস তার সামনেই বিদ্যমান, তিনি তা দেখে দেখে বর্ণনা দিচ্ছেন। হযরত আবু বকরের (রা.) গৃহীত এই ব্যবস্থায় এবং হুজুরের বাস্তবসম্মত উত্তরে কাফের মুশরিকদের এ পরিকল্পনাও নস্যাৎ হয়ে যায়। এবং তারা দারুনভাবে হতাশ হয়। উপস্থিত জনতার মধ্যে এমন অনেক লোকই ছিল যাদের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বায়তুল মাকদাসের আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। তারা রাসূলের (সা.) বর্ণনাকে সঠিক বলে মনে করে।

এরপরও আবু জাহেলের গোষ্ঠী খুশি না হয়ে আরো প্রমাণ দাবী করতে থাকে। হুজুর (সা.) তার চলার পথে বিভিন্ন বাণিজ্য কাফেলার সাথে দেখা হবার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ঐ সব কাফেলা ফিরে এলে তাদের কাছ থেকে এ ঘটনার স্বীকৃতিও পাওয়া যায়। এভাবে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই ভাবতে থাকে এমনটি কিভাবে হতে পারে? আজও কার কার মনে এ প্রশ্ন আছে যে, এমনটি কিভাবে হতে পারে। অবশ্য 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান তাই করতে পারেন, তিনি 'কুন, ফাইয়াকুনের' মালিক। এই বিশ্বাস যাদের আছে, তাদের মনে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় থাকার প্রশ্নই উঠেনা।

মে'রাজের এই ঘটনার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণ পূর্বক হাতে কলমে এ নামাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়- জিব্রাইল (আ.) এর তত্ত্বাবধানে। যে নামাজের নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসেন নবী মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র তোহফা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের কার্যকর উপায় হিসেবে। মে'রাজের পটভূমিতেই নাজিল হয় সূরায়ে বনী ইসরাইল। যেখানে মে'রাজের উল্লেখের সাথে সাথেই বনী ইসরাইলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াবাসীর প্রতি সাধারণভাবে ঈমানদারদের প্রতি বিশেষভাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব

www.bjilibrary.com

নেয়ামত। বনী ইসরাইল আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে ব্যর্থ হবার কারণে অভিশপ্ত হয়েছে। অনুরূপ অবস্থা যেন উম্মতে মুহাম্মাদীর না হয় 'সে মর্মে এতে রয়েছে সতর্কবাণী'। সূরায়ে বনি ইসরাইলের বিষয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়, এতে কাফের মুশরিকদেরকে বনী ইসরাইল ও অন্যান্য কওমের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অন্যথায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য, এই মর্মে সতর্কও করা হয়েছে। মে'রাজের পরেই হিজরাতের পর মদিনায় আল্লাহর রাসূলের (সা.) মুখোমুখি হতে হবে বনি ইসরাইলের লোকদেরকেও। অতএব তাদের জন্যেও তাদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতকে শেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করারও আহবান জানানো হয় তাদেরকে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পরিণতি বেদনাদায়ক ও ভয়াবহ হতে পারে। মানুষের সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের, সফলতা ও ব্যর্থতার মূল ভিত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে তৌহিদ, আখিরাত, নবুয়াত ও কুরআন যে সত্য তাও তুলে ধরা হয়েছে প্রামাণ্য যুক্তির ভিত্তিতে। এই মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ সংশয় দূর করার পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের অজ্ঞতার পরিণতি উল্লেখ করে তাদের প্রতি ভয় ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরায়ে বনী ইসরাইলের ২৩ নম্বর আয়াত থেকে ৩৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী আখলাক এবং সভ্যতা সংস্কৃতির তথা সমাজ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপরে ভিত্তি করে মানুষের সমাজ পরিচালনা করাই ছিল নবী মুহাম্মদ (সা.) উপস্থাপিত দাওয়াতের মূল দাবী। উল্লেখিত আয়াত সমূহের বক্তব্যকে আমরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের ইশতেহার বা মেনিফেস্টো হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যেটা পেশ করা হয়েছিল আরববাসীকে সামনে রেখে, যাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই নীলনকশার উপর ভিত্তি করেই মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে নিজ দেশে অত:পর গোটা দুনিয়ার মানুষের জীবনের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করতে চান।

www.bjilibrary.com

(৭)

মক্কী জীবনের শেষ ৩ বছর ঃ টার্নিংপয়েন্ট

উল্লেখিত বক্তব্যের পাশাপাশি শত বাধা প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ আপদের মুখেও মুহাম্মদকে (সা.) কুফরী শক্তির সাথে আপোষ না করে মজবুত ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কাফের মুশরেকদের জুলুম অত্যাচারে ও মিথ্যা অপবাদের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ ও আবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে সবর করার এবং শান্ত থাকার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দাওয়াত, তাবলীগ এবং ইসলামের কাজে সংযমি ও সংযত আচরণেরও তাগিদ দেওয়া হয়। যার আলোকে রাসূল (সা.) তার সাথী সঙ্গীদের পরিচালনা করেন সাফল্যের সাথে। রাসূল পাক (সা.) এর মক্কার জীবনে নবুয়াতের শেষ তিনটি বছর ছিল কঠিন অগ্নি পরীক্ষার বছর। এটাকে আমরা ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট এবং সিদ্ধান্তকারী অধ্যায়ও বলতে পারি। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, মক্কাবাসী থেকে হতাশ হয়ে আল্লাহর রাসূল তায়েফে যান। সেখানেও একইভাবে প্রত্যাখাত হন বরং তার চেয়েও বেশী মারাত্মক আঘাত পান শারীরিকভাবেও। তাই মক্কায় ফিরে এসে দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন নতুন আংগিকে। বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। এখানে তিনি শুধু দাওয়াত পেশ করেই শেষ করতেন না। তিনি একাজে তাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করতেন। হুজুরকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার, তাদের কওমের লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়ারও আহবান রাখতেন।

হুজুর যখন ঐসব স্থানে বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেতেন, আবু জাহেল ও আবু লাহাবের লোকেরাও তার পিছে পিছে যেতো, ঐসব গোত্রগুলোকে তারা সতর্ক করে দিতো যাতে রাসূলের কথা তারা না শুনে। যাতে করে তারা রাসূলের কথায় প্রভাবিত না হয়। অনেক সময় এই সব দুষ্ট লোকেরা

www.bjilibrary.com

রাসূলের প্রতি পাথর বা মাটিও নিক্ষেপ করত। এতদসত্বেও হুজুর তার কাজ করেই যেতেন। মক্কার বাইরে থেকে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি ওমরা বা ব্যবসা উপলক্ষে আসলে তাদেরকে রাসূল (সা.) দাওয়াত যেমন দিতেন, তেমনি একাজে তাদের সাহায্য সহযোগীতা কামনা করতেন। তাদের এলাকায় নিয়ে যাওয়ার কথাও বলতেন।

বিভিন্ন গোত্রের নিকট দাওয়াত প্রদান

রাসূল পাক (সা.) তদানীন্তন আরব বিশ্বের প্রায় সব প্রভাবশালী গোত্রের সাথে দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌছানোর প্রয়াস পান। এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত ষোলটি গোত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ-

১। কেমদাহ (দক্ষিণ আরবের এক বিরাট গোত্র)।

২। কালব (কুযায়ার একটি শাখা, ফুদমাতুল জান্দাল থেকে তাবুক পর্যন্ত ছিল যাদের এলাকা)।

৩। বনি বকর বিন ওয়ায়েল (আরবের বড় সংগ্রাম প্রবন গোত্র)।

৪। বনি আল বাক্কা (মক্কা ও ইরাক সীমান্তের পথে ছিল এদের অবস্থান।

৫। সা'লাবা বিন ওকাবা।

৬। বনি শায়বান বিন সা'লাবা

৭। বনি আন হারেস বিন কা'ব।

৮। বনি হানিফা (মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাব এ গোত্রের লোক ছিল)।

৯। বনু সুলায়েম (তাদের বাসস্থান ছিল খাযযারের নিকট নজদের উচু স্থানে)।

১০। বনি আমের বিন সা'সায়া (এরা গরমকালে তায়েফে এবং শীতকালে নাজদে কাটাতো)।

১১। বনি আবাস (বনি গাতফানের এক মস্তিন গোত্র)।

১২। বনি ওবরা (বনি আব্দুল্লাহ বিন গাতফানের অন্য একটি শাখা)।

১৩। বনি গাসসান (রোমীয় সাম্রাজ্যের মইনীন গাসসালাদের একটি রাষ্ট্রও ছিল)।

১৪। ফাযারা (এরা নাজদ এবং ওয়াদিউন কুরাতে বসবাস করত)।

www.bjilibrary.com

১৫। বনি আব্দুল্লাহ (এরা কালবের একটি অধস্তন গোত্র)।

১৬। বনি মহারিব বিন খাসামা (একটি মাদানী গোত্র)।

রাসূলে পাক (সা.) অত্যন্ত দরদভরা মন নিয়ে, একান্ত শুভকামনা ও কল্যাণ কামনার মূর্তপ্রতীক হিসেবে ঐসব গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে দীন কায়েমের কাজে তাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। রাসূল (সা.) তাদের কাছে এ আহবানও রাখেন যে, তোমরা আমাকে তোমাদের কওমের কাছে নিয়ে চল এবং এই কাজে আল্লাহর দীনের দাওয়াত সম্প্রসারনে ও বিস্তারে সাহায্য কর। রাসূলের (সা.) এই আহবানে কেউ কেউ সাড়া দেবার পরিবর্তে দুর্ব্যবহার করেছে। কেউ রাসূলের (সা.) কথাকে পছন্দ করা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছে। কেউ বলেছে হঠাৎ করেই তো নিজেদের বাপ দাদার দীন ত্যাগ করে নতুন দীন গ্রহণ করা যায় না। কেউ বলেছে, আমরা আমাদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তোমার দাওয়াতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আবার কেউ বলল, আগামী বছর হজ্জের মৌসুমে এসে আমাদের সিদ্ধান্ত জানানো যাবে। কেউ বলল, তোমার জন্যে আমরা কুরাইশদেরকে শত্রু বানাতে পারিনা। কেউ অজুহাত হিসেবে তুলে ধরে পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ভয়-ভীতির কথা। কেউ জানতে চাইল আমরা তোমাকে যদি সমর্থন করি, আর যদি তুমি বিজয়ী হও, তাহলে তোমার পরে নেতৃত্ব কতৃত্বের সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হবে কিনা।

আমরা যদি গভীরভাবে তদানীন্তন আরব বিশ্বের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দের ঐসব অজুহাত ও যুক্তিগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাহলে দেখা যাবে, আজকের দিনেও দীন কায়েমের আন্দোলনকে যারা ভাল জেনেও সমর্থন করতে পারছেনা অথবা অন্ধভাবে বিরোধিতা করছে, তাদের আর ঐ আরব নেতৃবৃন্দের কথাবার্তার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

আকাবার বায়াত এবং মদিনায় ইসলামের আলো

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তির আশীর্বাদ নিয়ে যারা রাজনীতি করে, তাদের অনেকেই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মনে করা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে চলে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে নিছক

www.bjilibrary.com

বৈষয়িক স্বার্থকে বড় করে দেখার কারণেই। তাছাড়া রাতারাতি ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার আশা এবং হারাবার ভয়ও অনেককে বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নিতে বাধ্য করে থাকে। রাসূল (সা.) এর এই যোগাযোগ আপাত দৃষ্টিতে সফল না হলেও একেবারে বৃথা গেছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের একটা নীরব প্রভাব অনেকের উপরই পরিলক্ষিত হয়। রাসূলের দাওয়াতের সত্যতা এবং যৌক্তিকতার স্বীকৃতি অনেকাংশেই নৈতিকভাবে তাদেরকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যকার বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের মনে এ বিশ্বাসও সৃষ্টি হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী এবং তার আন্দোলন একদিন সফল হবেই। তার বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবেনা। ফলে গোটা আরবে নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তার দাওয়াতের চর্চা শুরু হয়ে যায় বেশ ব্যাপকভাবে। অবশ্য এই কারণে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা বেড়ে যায় অনেক গুণে। তারা এর একটা শেষ সুরাহা করার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা পরামর্শের জন্যে বৈঠকের পর বৈঠকেও মিলিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে মদিনাবাসীর মাঝে রাসূলের দাওয়াত কবুলের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। যা কুরাইশদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরো অস্থির করে তোলে। রাসূলে পাক (সা.) এর হজ্জ মওসুমের যোগাযোগ মিশনের এক পর্যায়ে মদিনা থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। রাসূলের (সা.) সাথে মদিনা থেকে আগত প্রথম যে ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ হয়, তার সাথে ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক। সুয়ায়েদ বিন সামেত নামক উক্ত ব্যক্তি হুজুরের (সা.) দাদার মাতৃকুলের দিক থেকে আত্মীয় ছিলেন। তিনি তার কওমের কাছে একজন সম্মানিত, বিবেকবান ও কামেল মানুষ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। হজ্জ অথবা ওমরা উপলক্ষে তিনি মক্কায় এলে হুজুর (সা.) নিয়ম মাফিক তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দীনের দাওয়াত পেশ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন, সম্ভবতঃ আপনার কাছে তাই আছে যা আমার কাছেও আছে। হুজুর (সা.) জানতে চাইলেন সেটা কি? তিনি বললেন, সেটা হল ছহিফায়ে লোকমান। হুজুর (সা.) তাকে এটা থেকে পড়ে শুনাতে বললেন, তিনি তা পড়ে শুনানোর পর হুজুর (সা.) বললেন এটা সুন্দর কালাম। তবে আমার কাছে যা আছে তা এর চেয়েও উত্তম। আর তা হল কুরআন, যা আল্লাহ আমার উপর নাজিল করেছেন। এর পর

www.bjilibrary.com

হুজুর (সা.) তাকে কুরআন শুনিয়ে দেন এবং দীনের দাওয়াত দেন। তিনি বলেন সত্যি এ বড় সুন্দর কালাম। তারপর তিনি মদিনায় ফিরে যান এবং খাজরাজ কর্তৃক নিহত হন।

এরপরে রাসূল (সা.) দেখা করেন মদিনা থেকে আগত এমন একটি প্রতিনিধিদলের সাথে যারা মক্কায় এসেছিল তাদের প্রতিপক্ষ খাজরাজ গোত্রের মোকাবিলায় কুরাইশদের সাথে মৈত্রিচুক্তি করে তাদের সহযোগিতা পাবার আশায়। আউস গোত্রের বনী আব্দুল আশহালের এই প্রতিনিধি দল কুরাইশ সর্দার ওতবা বিন রাবিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করছিল। সে তাদেরকে খুব সম্মানের সাথে আতিথেয়তা করছিল। অবশ্য ওতবা বিন রাবিয়া উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয়নি। এদের আগমনের খবর পেয়ে রাসূল (সা.) দেখা করেন এবং বলেন যে, তোমরা যে বিষয়ের জন্যে এসেছো, তার চেয়ে উত্তম কিছু গ্রহণ করা পছন্দ করবে কি? তারা জানতে চাইল সেটা কি? হুজুর (সা.) উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহর বান্দাদেরকে এ দাওয়াত দিতে এসেছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও বন্দেগী করবে না, তার সাথে কাউকে শরীকও করবে না। আমার ওপর একটি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এরপর রাসূল (সা.) তাদেরকে কুরআন শুনান এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দান করেন। ঐ প্রতিনিধি দলের ইয়াস বিন মুয়াম নামের এক যুবক বলল, হে লোকেরা এ জিনিষ তার চেয়ে উত্তম, যার জন্যে তোমরা এসেছো। সাথে সাথে আবু হায়সের বাহ্‌তার তার মুখে মাটি ছুড়ে মারল এবং বলল, রাখ এসব কথা, আমরা তো অন্য এক কাজে এসেছি। আমরা এসেছি কুরাইশদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তির জন্যে। আর একথা মেনে নিলে তাদেরকে শত্রু বানানো হবে। এই প্রতিনিধি দল মদিনায় ফিরে গেলে তাদের দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসা গোত্রীয় সংঘাতের জের ধরে বুয়াস যুদ্ধ শুরু হয়। এই সাক্ষাতের ফলে ইয়াস বিন মুয়ায ইসলাম কবুল করেই মদিনায় ফিরে যান। কিছু দিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবং ইসলামের উপরই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

নবুবী একাদশ বছরের হজ্জে মৌসুমে মদিনার খাজরাজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে দেখা হয়। তিনি যথারীতি তাদের কাছে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর দাওয়াত পেশ করলেন। তাদেরকে কুরআন শুনালেন। তাদের মধ্যে পরস্পর বলা বলি শুরু হল, সম্ভবত ইনিই সেই নবী, ইহুদিরা

www.bjilibrary.com

আমাদেরকে যার ভয় দেখাতো। এমন যেন না হয় যে তারা আমাদের থেকে আগে চলে যায়। অতঃপর এই প্রতিনিধিদল সন্তুষ্ট চিত্তে? রাসূলের দাওয়াত কবুল করে ইসলামের উপর ঈমান আনেন। তারা মদিনায় তাদের কওমকে যে বিবাদমান অবস্থায় রেখে এসেছে তার বর্ণনা দিয়ে আরজ করলেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। আমরা আপনার পক্ষ থেকে তাদেরকে দাওয়াত দিব। যে দীন আমরা গ্রহণ করলাম তা তাদের কাছে পেশ করব। যদি আল্লাহ্ তায়ালা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে মিলিয়ে দেন তাহলে আপনার চেয়ে আর কেউ শক্তিশালী থাকবে না।

কোন কোন বর্ণনা মতে, এই প্রতিনিধি দল ঈমানের ঘোষণার অংশ হিসেবে রাসূলের কাছে বায়াত করেন। বায়াত শেষে রাসূল (সা.) তাদের কাছে জানতে চান, আপনারা কি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন? যাতে আমি রবের পয়গাম পৌছাতে পারি। তখন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হল, সবেমাত্র আমাদের ওখানে বুয়াসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেখানে লোকদের পক্ষে একত্রিত হতে সমস্যা আছে। আপাতত আপনি আমাদেরকে আপন লোকদের মাঝে ফিরে যেতে দিন। আমাদের লোকদের কাছে সেই দাওয়াত পৌছাই যে দাওয়াত আপনি আমাদের দিয়েছেন। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আল্লাহ্ তায়ালা আপনার অছিলায় ভাল করে দেবেন। আপনার জন্যে বিবদমান গোত্র দুটির মধ্যে ঐক্য সংহতি গড়ে উঠলে আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ থাকবেনা। আমরা সামনের হজ্জের সময় আবার আপনার সাথে মিলিত হবো।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মদিনায় তাওরাতের ধারক বাহক ইয়াহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল দীর্ঘ দিনের। আউস ও খাজরাজ নামের গোত্র দুটি এখানে এসে বসতি স্থাপন করে মূলতঃ বাইরে থেকে এসে। তাদের অধঃস্তন পুরুষ ছিল ইয়ামেনের অধিবাসী। আউস, খাজরাজ মূলত: একই গোত্রের দুটি শাখা। একই বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ছিল কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তির লড়াই। প্রথমত: ইয়াহুদীরা এদেরকে মদিনা শহরের ভেতরে ও মূল ভূখন্ডে বসবাস করতে দেয়নি। ফলে তারা আশপাশে অনুর্বর ও অনুন্নত স্থানে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গাসসানীদের সহযোগিতায়, ইয়াহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তিটা হ্রাস করার মাধ্যমে। তবে এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ইয়াহুদীরা শিক্ষা দীক্ষায় এবং ব্যবসা

www.bjilibrary.com

বাণিজ্যে অগ্রসর হবার কারণে তাদের প্রভাব কখনও নি:শেষ হয়ে যায়নি। অন্য দিকে দুই গোত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষ-সংঘাত থেকে সুযোগ গ্রহণেও তারা কখনও পিছিয়ে থাকেনি।

মদিনার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর ইয়াহুদীদের প্রভাব ছিল অনিস্বীকার্য, তাওরাতের তথা আসমানী কিতাবের চর্চা থাকায় নবুওয়াত, অহি প্রভৃতি সম্পর্কে ইয়াহুদীরাও মোটামুটি একটা ধারণা রাখত। এখানে ত্রিমুখী সংঘাত মুখর পরিবেশকে কেন্দ্র করে শেষ নবীর দাওয়াত কুবলের, তার নেতৃত্ব গ্রহণের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় সকলের অজান্তে। একদিকে আউস খাজরাজ দুটি গোত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীরা প্রায় বলত, সর্বশেষ নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আবির্ভূত হলেই তার নেতৃত্বে তোমাদেরকে দেখে নেব। কথাটি আউস, খাজরাজদের দুটি বিবাদমান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে বেশ গুরুত্বের সাথেই বিবেচিত হয়। অপর দিকে তারা পরস্পরের ঝগড়া ফাসাদে, সংঘাত সংঘর্ষে এবং যুদ্ধ বিগ্রহে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে পরে। করতে থাকে শান্তির সন্ধান। নিজেদের মধ্যে তারা আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইকে বাদশাহ বানিয়ে, অশান্তির অবসান ঘটিয়ে, শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতে মক্কায় হজ্জ উপলক্ষে গিয়ে শেষ নবীর সন্ধান পাওয়ায় তারা সাংঘাতিকভাবে উৎসাহিত হয়। শান্তির অন্বেষা তাদের পৌঁছে দেয় রহমাতুল্লিল আলামিনের সন্ধানে। পক্ষান্তরে আসমানী কিতাবের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, নবী মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী হিসেবে আগমনের নিশ্চিত ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অভিশপ্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায় এ নেয়ামত লাভে বঞ্চিত থেকে গেল নিছক কায়েমীস্বার্থে অন্ধ হবার কারণে। শেষ নবী বনী ইসহাক থেকে না হয়ে বনী ইসমাঈল থেকে হবার কারণে। আকাবার স্থানে প্রথম ইসলাম কবুলকারী ও বায়াত গ্রহণকারী দলটি (লোকের সংখ্যা ছিল ছয় মতান্তরে আট) মদিনায় ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করে দেয়। ফলে আনসারদের (আউস ও খাজরাজ গোত্রের) ঘরে ঘরে মুহাম্মদ (সা.) এর নাম ও তার পয়গাম পৌঁছে যায়। অত:পর আগের বছরের ওয়াদা অনুযায়ী এবার (নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে) মদিনা থেকে বার জনের একটি

www.bjilibrary.com

প্রতিনিধি দল মক্কায় গমন করেন এবং হুজুর (সা.) এর সাথে ঐ আকাবার স্থানে মিলিত হন, যেখানে বিগত বছরে খাজরাজের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই বার জনের মধ্যে পাঁচ জন গত হজ্জের সফরে মক্কায় আসেন এবং ইসলাম কবুল করেন। অবশিষ্ট সাত জনের মধ্যে পাঁচজন খাজরাজ গোত্রের এবং দুজন ছিলেন আউস গোত্রের।

আকাবায় প্রথম বায়াত গ্রহণকারী ছয়জনের নাম নিম্নরূপঃ-

১। আবু উসামা আসয়াদ বিন যুরারা

২। আওফ বিন আল হারেস বিন রিকায়া

৩। রাফে বিন মালেক

৪। কুতবা বিন আমের বিন হাদিদা

৫। ওতবা বিন আমের বিন নাবি

৬। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রেয়াব

উক্ত ছয়জনের মধ্য থেকে এবারে পাঁচজন এই কাফেলায় শামিল হন। একজন বাদ থাকেন, তিনি ছিলেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিয়াব। দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলের বাকী সাতজনের নাম নিম্নরূপঃ-

১। খাজরাজের বনী নাজ্জার থেকে অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর নানার খান্দান থেকে একজন। নাম তার সূরায় আল হারেস বিন রেকায়া।

২। খাজরাজের বনী যুরাইল থেকে একজন, যাকরান বিন আব্দ কায়েস।

৩। খাজরাজের বনী আওফ বিন আল খাজরাজ থেকে দুজন ওবাদা বিন সামেত ও

৪। ইয়াজিদ বিন সা'লাবা

৫। খাজরাজের বনী সালেম বিন আওফ বিন খাজরাজের আব্বাস বিন ওবাদা বিন নাদলা।

৬। আউসের বনী আশহাল থেকে, আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান (ইনি জাহেলী যুগের তওহীদের অনুযায়ী ছিলেন এবং পূর্তিপূজা থেকে ছিলেন মুক্ত)

www.bjilibrary.com

৭। আউসের বনী আমর বিন আওফ থেকে ওয়াইস বিন সায়েদা।

এই প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূলের হাতে নিম্নোক্ত ভাষায় বায়াত গ্রহণ করেন:

"আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না। চুরি করবনা, ব্যভিচার করবনা, আমাদের সন্তানদের হত্যা করবনা, আমরা কারো বিরুদ্ধে কোন রূপ অন্যায় ও বানোয়াট অভিযোগ (তোহমত) উত্থাপন করব না। আমরা কোন ভাল কাজে রাসূলের (সা.) নাফরমানী করবনা, বরং তার কথা শুনব এবং মানব) সুখে-দু:খে সর্বাবস্থায়, সে আদেশ আমাদের মনোপুত হোক আর না হোক। এমনকি আমাদের ওপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও। আমরা হুকুমদাতা বা শাসনদন্ডের মালিকের সাথে কোন তর্ক বিতর্কে জড়িত হবনা। (মুসনাদে আহমদের অতিরিক্ত বাক্য হল, যদিও তোমরা মনে কর যে শাসন কার্যে তোমাদের অধিকার আছে। আর বোখারীর অতিরিক্ত বাক্য হল অথবা যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও) এবং আমরা যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন সত্য কথা বলব। এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোওয়া করবনা। অতএব তোমরা যদি এ শপথ পূরণ কর তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। আর যদি কেউ হারাম কোন কাজ করে বস তার বিষয়টি থাকবে আল্লাহর বিবেচনায়। তিনি চাইলে মাফ করবেন, আর না চাইলে শাস্তি দিবেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, যদি তোমরা একটি হারাম কাজ করে বস; এবং ধরা পড়, সে জন্যে এই দুনিয়ায় কোন শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তা হবে সে অপরাধের কাফ্ফারা। আর কিয়ামত পর্যন্ত তোমার সে অপরাধ যদি গোপন থেকে যায়, তাহলে সে বিষয়ে আল্লাহ চাইলে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন।

আকাবায় এই দ্বিতীয় বায়াতের পর প্রতিনিধি দলটি মদিনায় চলে যায়। তাদেরকেসহ মদিনাবাসীকে দীন শিখানোর জন্যে সাথে দেওয়া হয় মুসয়াব বিন উমাইরকে।

www.bjilibrary.com

(৮)

আকাবার শেষ বায়াত :
মদিনায় রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শপথ

রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কী জিন্দেগীর সর্বশেষ তিনটি বছর ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। একদিকে নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর নিজের জন্মভূমিতে তার আদর্শ ও দাওয়াত দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয় স্বগোত্রীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে। অন্যদিকে মদিনায় পরিলক্ষিত হতে থাকে তার আদর্শ বাস্তবায়নের অনুকূল হাওয়া। আমরা ইতোমধ্যেই নবুওয়াতের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে পর পর দুটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলের (সা.) সফল ও সার্থক আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথম দফায় ছয়জন বা আটজনের প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম কবুল করে এবং রাসূলের (সা.) বায়াত গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে যায়। পরের বছর তাদের পাঁচজনের সাথে আরো সাতজন যোগ হয়ে, মোট বারজন প্রতিনিধি এসে দ্বিতীয় দফায় বায়াত গ্রহণ করে চলে যায়। সাথে নিয়ে যায় মুসয়াব বিন উমাইরকে।

এই দ্বিতীয় বায়াতে আকাবার পর মদিনায় ফিরে এসে আনসার গোত্রের (বনি আউস ও খাজরাজের) লোকজন হযরত মুসয়াব বিন উমাইরের নেতৃত্বে বেশ দ্রুততার সাথে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করে দেন। মক্কায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে যেসব বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এখানে বলতে গেলে তার কোন লেশমাত্রও তেমন দেখা যায়নি। হযরত মুসয়াব বিন উমাইরের নেতৃত্বে আনসার গোত্রের (বনি আউস ও খাজরাজের) এই দাওয়াতী তৎপরতায় মৃদু বিরোধিতা করতে দেখা যায় মাত্র দুজন প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে। কিন্তু তারা দুজন হযরত মুসয়াব বিন উমাইরের ব্যবহারে ও

www.bjilibrary.com

কথায় সন্তুষ্ট হয়ে এবং কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম কবুল করেন এবং বিরোধিতা পরিহার করে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।

মদিনাবাসী আহলে কিতাবের ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। তারা সেখানে ইয়াহুদিদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয়ে উপাসনা করতে দেখেছে। তাদের সাপ্তাহিক দিনটি ছিল সাবাত বা শনিবার। অনুরূপভাবে ঈসায়ীরাও রবিবারে সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্যে একত্রিত হত। মদিনার আনসারগণ তাই জুমআর নামাজের হুকুম আসার আগেই সপ্তাহে একদিন সবাই একত্রিত হয়ে নামাজ আদায়ের সিদ্ধান্ত নেন। সর্বপ্রথম জুমআর নামাজ আদায় করেন হযরত আসয়াদ বিন যুবায়ের বায়াযা এলাকায় ৪০ জন মুসলমানকে সাথে নিয়ে। ইতোমধ্যে মক্কায় রাসূলের (সা.) উপর সূরায়ে জুমআ নাজিল হয় যাতে জুমআর নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। মক্কায় যেহেতু জুমআ আদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না বিধায় রাসূল (সা.) মদিনায় হযরত মুসয়াব বিন উমাইরকে লিখিত নির্দেশ দেন জুমআর নামাজের ব্যবস্থা করার জন্যে। যে মদিনাকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর নবীর নেতৃত্বে দীনের বিজয়ের জন্যে বাছাই করেছিলেন মুহাম্মদের (সা.) জন্মভূমি মক্কারও আগে। সেখানে রাসূলের (সা.) গমনের আগেই জুমআর নামাজ কায়েমের ব্যবস্থা করেন তিনি মূলতঃ দীনের বিজয়ের আগমনী বার্তা হিসাবে। এই জুমআর জামায়াতকে কেন্দ্র করে ইসলামী আদর্শের প্রচার প্রসার মদিনার সকল মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত গতিতে।

দ্বিতীয় বায়াতে আকাবার পর দেখতে দেখতে একবছর পার হয়ে আসে। মদিনায় ইসলামের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এই সময়ের মধ্যে। মদিনাবাসীর জন্যে আবার শুরু হয় হজ্জে যাবার প্রস্তুতি। এই হজ্জের সফরেই অনুষ্ঠিত হয় আকাবার শেষ বায়াত। এবারের হজ্জের সফরটি ছিল তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইমাম আহমদ এবং তাবারানী এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) দশ বছর যাবত ওকায ও সাজান্নার মেলাগুলোতে এবং হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের শিবিরে যাওয়া আসা করতে থাকেন। তাদের সাথে মিলিত হয়ে বলতেন "কে আছ যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে, আমাকে সাহায্য করতে পারবে, যাতে আমি আমার রবের পয়গাম পৌঁছাতে পারি, আর এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে।"

www.bjilibrary.com

কিন্তু কেউ তার সহযোগিতার জন্যে প্রস্তুত হয়নি। বরং যদি ইয়ামান অথবা মুদারার কোন লোক মক্কা যাওয়ার জন্যে তৈরী হত তখন তার কওমের লোকেরা অথবা আত্মীয় স্বজন তাদেরকে বলতো, কুরাইশের সেই যুবক থেকে সাবধান থাকবে, দূরত্ব বজায় রেখে চলবে যাতে করে সে তোমাদেরকে কোন রকমের ফেৎনায় ফেলতে না পারে।

হুজুর যখন কোন শিবিরের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হত। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদেরকে ইয়াসরেব (মদিনা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট পাঠিয়ে দেন। আমরা তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেই। তারপর অবস্থা এমন হয় যে, একজন বাড়ি থেকে বের হয়, ঈমান আনে, কুরআন পড়ে এবং যখন বাড়ী ফিরে যায়, তখন তার বাড়ীর লোকজন সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে আনসারের মহল্লাগুলোতে এমন কোন মহল্লা আর রইল না যেখানে মুসলমানদের একটি দল পাওয়া যেতো না, এবং তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা করতো না। এমতাবস্থায় আমরা একদিন সমবেত হয়ে আলোচনা করলাম, আর কতদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আমরা এভাবে ফেলে রাখবো যে, তিনি মক্কার পাহাড়গুলোর স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াবেন আর সবখানে প্রত্যাখ্যাত হতে থাকবেন, কোথাও তার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবেনা। এরপর আমরা সত্তুর জন হজ্জে যাই এবং আকাবায় তার সাথে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।

ইমাম আহমদ, তাবারানী ইবনে জারীর তাবারানী ও ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত কা'ব বিন মালেকের (রা.) বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমরা আমাদের কওমের মুশরিকদের সাথে হজ্জে জন্যে রওয়ানা হই। সাথে আমাদের সর্দার ও বুযুর্গ বারা বিন মা'রুরও ছিলেন। চলার পথে তিনি বললেন আমার একটা অভিমত আছে। তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা জানিনা। আমরা বললাম আপনার সে অভিমতটা কি? তিনি বললেন, আমার মত এই যে আমি কা'বার দিকে পিঠ না করে বরং কা'বার দিকে মুখকরে নামাজ পড়ি। আমরা তো রাসূলের (সা.) নিকট থেকে জেনেছি যে তিনি শামের দিকে (বায়তুল মাকদাসের) মুখ করে নামাজ পড়েন। আমরা আপনার মত করে নামাজ পড়বনা। কিন্তু তিনি কা'বার দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তে থাকেন। এ জন্যে আমরা তাকে

www.bjilibrary.com

তিরষ্কার করতে থাকি। মক্কা পৌঁছার পর তিনি আমাকে বললেন ভাতিজা চল রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি। কারণ তোমাদের বিরোধিতার কারণে আমার মনে খট্‌কা সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার এই কাজের ব্যাপারে রাসূলকে (সা.) জিজ্ঞেস করতে চাই। ইতিপূর্বে আমরা কখনও হুজুরকে দেখিনি তাকে চিনতামও না। তাই এজন্যে মক্কার একজন লোকের কাছে তাঁর ঠিকানা জানতে চাইলাম। সে বললো তার চাচা আব্বাসকে চেন? আমরা বললাম হ্যাঁ, কারণ তিনি ব্যবসা উপলক্ষে আমাদের ওখানে যাতায়াত করতেন। সে বলল, মসজিদুল হারামে যাও। সেখানে তাকে আব্বাসের সাথে বসা দেখতে পাবে।

আমরা সেখানে পৌঁছে তাকে সালাম দিলাম। তিনি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি এদের দুজনকে চেনেন? হ্যাঁ, ইনি বারা বিন মা'রুর এবং ইনি কা'ব বিন মালেক। আমি হুজুরের একথা কখনও ভুলবনা, তিনি আমার নাম শোনা মাত্র বললেন, কবি? আব্বাস বললেন হ্যাঁ। এরপর বারা তার মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। হুজুরের নির্দেশ অনুযায়ী এরপর থেকে তিনি সেই কেবলার দিকেই নামাজ পড়তে থাকেন যেদিকে হুজুর পড়তেন। এর পর হুজুর আমাদেরকে আইয়ামে তাশরীকের সময়ে আকাবায় দেখা করতে বললেন।

সেই রাতে আমরা আমাদের শিবিরে শুয়ে পড়লাম। রাতের তিন ভাগের একভাগ অতিবাহিত হবার পর আমরা চুপিসারে তার সাথে দেখা করার জন্যে চললাম। কেননা আমাদের কওমের মুশরিকদের কাছে বিষয়টি আমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের সর্দার এবং অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবু জাবের আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ছিলেন। তিনি বাপ দাদার দীনের উপরই কায়েম ছিলেন। তাকে আমার সাথে নিয়ে বললাম, আপনি আমাদের সর্দার এবং সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন। আমরা চাইনা যে আপনি জাহান্নামের ইন্ধন হোন। তারপর আমরা তার কাছে ইসলাম পেশ করলাম এবং বললাম এখন আমরা আকাবায় যাচ্ছি নবী মুহাম্মদের (সা.) সাথে মিলিত হবার জন্যে। তিনি সাথে সাথে ইসলাম কবুল করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় বায়াতে শরীক হলেন। তখন আমরা মোট ৭০ জন পুরুষ ছিলাম। আমাদের সাথে দুজন মহিলাও ছিলেন। তাদের একজন বনী নাজ্জারের নাসিবা বা নুসাইবা

www.bjilibrary.com

বিনতে কা'ব উম্মে উমারা। অপরজন বনী সালেমার আসমা বিনতে আমর উম্মে মানী।

উক্ত বায়াতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হযরত জাবের (রা.) সত্তুর বলেছেন, কোন মহিলার কথা উল্লেখ করেননি। এই একই বক্তব্য আহমদ ও বায়হাকী আমের শা'বি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) ৭২ জন পুরুষ এবং ২জন মহিলার কথা তাদের নামসহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক এর সাথে অতিরিক্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩জন পুরুষের ১১জন আউসের এবং ৬২ জন ছিলেন খাজরাজের এবং তাদের সাথে ২জন মহিলাও ছিলেন। তাদের একজন নুসাইবা বিনতে কা'ব তার স্বামী জায়েদ বিন আসেম (রা.) এবং দুপুত্র হাবিব (রা.) ও ওবায়দুল্লাহ (রা.) সহ ছিলেন। দ্বিতীয়জন ছিলেন আসমা বিনতে আমর। (সংখ্যা নিয়ে এধরনের ভিন্নমতের কারণ সাধারণতঃ আরবরা ভগ্নাংশ উল্লেখ করে অভ্যস্ত নয়। অন্য দিকে পুরুষের সংখ্যার তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় তা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করেনি।)

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে উযাইম বিন মায়েদার যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন সা'দবিন খায়সামা (রা.) মায়ান বিন সা'দি (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে দেখা করে সালাম দিয়ে আসি। কারণ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে দেখিনি। অতএব আমরা বের হলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। আমরা সেখানে পৌঁছলাম। তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মদিনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে আপনার সাক্ষাৎ কোথায় হবে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, তোমাদের সাথে তো কিছু বিরোধী লোকও আছে। অতএব নিজেদের ব্যাপারটা হাজীরা চলে যাওয়া পর্যন্ত গোপন রাখ। রাসূল (সা.) সাক্ষাতের জন্যে সেই সময়টি নির্ধারণ করেছেন যখন হাজীগণ মিনা থেকে বিদায় হয়ে যায়। আর এ সাক্ষাতের স্থান হিসাবে তিনি আকাবার উঁচু অংশকে নির্ধারণ করেছেন। এই মর্মে আরো নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবে না। যে আসেনি এমন কারো জন্যে অপেক্ষাও করবেনা।

www.bjilibrary.com

শেষ বায়আতে আকাবার বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ভিন্নতা থাকলেও এই ব্যাপারে ঐকমত্য পাওয়া যায় যে, তখন এই সব লোকেরা দুজন চারজন করে গোপনীয়তা রক্ষা করে নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছেন এবং রাসূলকে (সা.) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সাথে দেখতে পান। যদিও ঐ সময় পর্যন্ত হযরত আব্বাস প্রকাশ্যতঃ অমুসলিম ছিলেন তথাপি রাসূল (সা.) তার নিজের ব্যাপারে (নিরাপত্তাসহ) তার প্রতি ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। হযরত আব্বাস রাসূলের (সা.) এই সিদ্ধান্তকারী মুহূর্তে এখানে এসেছিলেন মুলত: এটা নিশ্চিত করার জন্যে যাতে হুজুরের মক্কা ছেড়ে মদিনা যাওয়ার পূর্বে যেন সবদিক চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

এরপর আলোচনা শুরু হয়। সূচনা বক্তব্যে রাসূলে পাক (সা.) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যে যা বলতে চায়, তা যেন সংক্ষেপে বলে। কারণ মুশরিকদের গুপ্তচর পেছনে লেগে আছে।

কা'ব বিন মালেক (রা.) এর বর্ণনা মতে সবার আগে হযরত আব্বাস কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, হে খাজরাজের লোকেরা, মুহাম্মদের এখানে যে মর্যাদা আছে তা তোমরা জান। যারা তার সম্পর্কে আমাদের সমমনা (অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি) তাদের মোকাবিলায় আমরা (বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিব) তাকে সমর্থন করেছি ও নিরাপত্তা দিয়েছি। এজন্যে তিনি স্বীয় কওমের মধ্যে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছেন। কিন্তু তিনি তোমাদের ওখানে যাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন। এখন তোমরা ভেবে দেখ, যে ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি ও শর্তে তোমরা তাকে তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, তাকে ডাকছ, তোমরা সে প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষা করতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে তার বিরোধী ও প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তোমরা তার হেফাজতের পূর্ণ ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কিন্তু তিনি এখান থেকে বের হয়ে যাবার পরে তোমাদের সাথে মিলিত হবার পর কোন এক পর্যায়ে যদি তোমাদের এমন আশংকা হয় যে তার সংশ্রব ত্যাগ করতে এবং তাকে দুশমনদের হাতে তুলে দিতে তোমরা বাধ্য হবে; তাহলে এটাই হবে উত্তম যে তোমরা এখান থেকেই তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তিনি তার কওমের কাছে সুদৃঢ় মর্যাদার অধিকারী এবং শহরেও সুরক্ষিত স্থানে বাস করেন।

www.bjilibrary.com

আমরা বললাম, আপনার কথা তো শুনলাম, এবার হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি বলুন, কি কি ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদের কাছ থেকে পেতে চান তা নিয়ে নিন। তারপর হুজুর (সা.) তার ভাষণে প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, ইসলামের ব্যাপারে প্রেরণা দান করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের থেকে এ কথার ওপর বায়াত নিচ্ছি যে, তোমরা ঠিক সেভাবে আমার সহযোগিতা ও হিফাজত করবে যেমন তোমাদের জানের ও সন্তানদের হেফাজত করে থাক।

বারা বিন মারুর (রা.) হুজুরের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আরজ করেন জি হ্যাঁ, সেই খোদার কসম যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন আমরা সে সব বিষয় থেকে আপনাকে হেফাজত করব, যেসব থেকে আমরা আমাদের জান ও আওলাদের হেফাজত করে থাকি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করুন। আমরা যুদ্ধের পরীক্ষিত লোক। আমরা বাপ দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ সব পেয়েছি।

মাঝখান থেকে আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাদের সাথে অন্যান্যদের (ইয়াহুদিদের) যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে আপনার জন্যে তো তা ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করার পর আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার কওমের কাছে চলে আসবেন। হুজুর (সা.) মুচকি হেসে বললেন, না না। বরং এখন খুনের সাথে খুন এবং কবরের সাথে কবর। অর্থাৎ আমার মরণ ও জীবন এখন তোমাদের সাথে। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। যাদের সাথে তোমাদের লড়াই, তাদের সাথে আমারও লড়াই। আর যার সাথে তোমাদের সন্ধি, তার সাথে আমারও সন্ধি।

শেষ আকাবার বায়াত প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারীর বর্ণনার কিছু অংশ উল্লেখ করেছিলাম। তার বাকী অংশে তিনি যা বলেছেন তা হল: আকাবায় আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সাথে মিলিত হবার পর আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমরা কোন বিষয়ের উপর আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করব। হুজুর (সা.) বললেন, "তোমরা ভালমন্দ সকল অবস্থায় হুকুম মেনে চলবে, আনুগত্য করবে।

www.bjilibrary.com

অবস্থা স্বচ্ছল হোক বা অস্বচ্ছল সকল অবস্থায় সম্পদ ব্যয় করবে। সৎ কাজের হুকুম করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বলবে, কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেনা। আরো বায়াত করবে একথার উপর যে, আমি যখন তোমাদের ওখানে আসব তখন তোমরা সকলে সে জিনিষ থেকে আমাকে হেফাজত করবে, যা থেকে তোমাদের জান ও আওলাদের হেফাজত কর। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। একথার পর আমরা সবাই উঠে তার দিকে অগ্রসর হলাম। আমাদের দলের সব চেয়ে কম বয়স্ক এক যুবক আসয়াদ বিন যুরারা রাসূল (সা.) এর হাতকে তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, হে ইয়াসরেববাসী, থাম। আমরা উট দৌড়িয়ে তার কাছে একমাত্র এজন্যেই এসেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। আজ এখান থেকে তাকে বের করে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হল সারা আরবের দুশমনী খরিদ করা। এর পরিণাম পরিণতিতে তোমাদের নতুন প্রজন্ম হবে রক্তে রঞ্জিত তরবারীর শিকার। যদি এসব বরদাশত করার শক্তি তোমাদের থাকে তাহলে তার হাত চেপে ধর। তোমাদের প্রতিদান আল্লাহর হাতে। আর যদি তোমাদের জানের ভয় থাকে তাহলে তাকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ কর। আর পরিষ্কার ওজর পেশ কর। কারণ এ সময় ওজর আপত্তি পেশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। একথা শুনে সবাই বলে উঠল আসয়াদ আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও। খোদার কসম, আমরা কখনও এ বায়াত ত্যাগ করব না। আর এর থেকে হাত সরিয়ে নেব না। এরপর সবাই বায়াত করেন।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে হিশাম আসেম বিন উমর বিন কাতাদার বরাত দিয়ে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন বায়াতের সময় আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদলা আনসারী বলেন, খাজরাজের লোকেরা কি জান, এ ব্যক্তি থেকে তোমরা কোন জিনিসের বায়াত নিচ্ছ? সবাই উচ্চ স্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ, জানি। আব্বাস তার কথায় জোর দিয়ে বললেন, তোমরা সাদা ও কালো সকলের সাথে লড়াইয়ের বায়াত করছো। অর্থাৎ এ বায়াত করে সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই এর আহবান করছ। এখন যদি তোমরা ধারণা কর, যখন তোমাদের ধন সম্পদ ধ্বংসের আশংকা হবে, আশংকা

হবে সম্ভ্রান্ত লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার, তখন তোমরা এ ব্যক্তিকে তোমাদের দুশমনদের হাতে তুলে দেবে। তাহলে এটাই উত্তম যে, তোমরা এখনই তাঁকে পরিত্যাগ কর। কারণ খোদার কসম এটা হবে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনার কারণ। আর যদি তোমরা মনে কর যে, যে প্রতিশ্রুতিসহ তোমরা এ ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছ, তাকে আপন ধন সম্পদ এবং সম্মানি ব্যক্তিদের ধ্বংসের আশংকা সত্ত্বেও সব সামলে নেবে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার হস্ত ধারণ কর। খোদার কসম, এটাই হবে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে মংগলজনক। উপস্থিত সকলে একমত হয়ে বলল, আমরা তাঁকে নিয়ে আমাদের ধন সম্পদ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত আছি। এরপর সকলে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমরা যদি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করি তাহলে আমাদের পুরস্কার কী? তিনি বললেন জান্নাত।

ইবনে সা'দ হযরত মুয়ায বিন রিফায়া বিন রাফে এর বর্ণনা ওয়াফদার বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করে বলেন, আকাবার স্থলে সকলে একত্রিত হবার পর হুজুরের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বক্তব্য এভাবে শুরু করেন, হে খাজরাজের দল তোমরা মুহাম্মদকে (সা.) তোমাদের ওখানে যাওয়ার জন্যে দাওয়াত দিয়েছ। তোমরা জেনে রাখ, মুহাম্মদ (সা.) তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সবচেয়ে সুদৃঢ় মর্যাদা সম্পন্ন। আমাদের মধ্যে যারা তার দীন গ্রহণ করেছে, আর যারা করেনি, তারা সকলে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে তার হেফাজত করছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) সবাইকে ছেড়ে তোমাদের কাছেই যেতে চান। এখন তোমরা ভাল করে বুঝে পড়ে দেখ। সমগ্র আরবের শত্রুতার মোকাবিলা করার মত এতটা সামরিক শক্তি, দূরদর্শিতা ও সাহস-হিম্মত তোমাদের আছে কিনা। কারণ আরবরা একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব, চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত কর। পরস্পর পরামর্শ কর এবং সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নাও। কারণ সবচেয়ে ভাল কথা হল সত্য কথা। এরপর হযরত আব্বাস তাদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কিভাবে দুশমনদের সাথে লড়াই কর আমাকে একটু বুঝিয়ে বল। এ প্রশ্নের জবাব দেন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম যিনি শেষ বায়াতে আকাবার পূর্বক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধে আমরা অভ্যস্ত। এটা আমরা লাভ করেছি বাপ দাদার

www.bjilibrary.com

পক্ষ থেকে উত্তারাধিকার সূত্রে। তার বিস্তারিত বক্তব্যে হযরত আব্বাস সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, তোমরা সত্যি যোদ্ধার জাতি। এরপর বারা বিন মারুর বলেন, আমরা আপনার কথা শুনলাম। খোদার কসম! আমাদের মনে অন্য কিছু থাকলে তা পরিষ্কার করে বলতাম। আমরা তো সত্যিকার অর্থে রাসূলকে (সা.) দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চাই এবং তার জন্যে জীবন দিতে চাই।

ওয়াকেদী অন্য একটি বর্ণনায় হযরত বারা বিন মা'রুরের এ ভাষণের ব্যাপারে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা বলেছেন। তাহল, আমরা প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম ও লড়াইয়ের শক্তি রাখি। আমরা যখন পাথরের পূজা করতাম তখনই যখন এ অবস্থা ছিল আর এখন আমাদের অবস্থা কেমন হতে পারে যখন আল্লাহ আমাদেরকে সত্য দেখিয়ে দিয়েছেন যে ব্যাপারে অন্যরা আছে অন্ধকারে। আর মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।

রাসূল (সা.) এর মক্কার জীবনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমার কোন ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) ও তার সাথী সঙ্গীগণ কিভাবে ছবর ও ইস্তেকামাতের পরিচয় দিয়েছেন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মোকাবিলায় কিভাবে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে দীনের দাওয়াত এগিয়ে নিয়েছেন, রাসূল (সা.) তার সাথী-সঙ্গীদের কিভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বিরোধী পক্ষের চরম দুর্ব্যবহারের মোকাবিলায় তারা কিভাবে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করছেন, প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে নেওয়ার জন্যে কি কি কর্মকৌশল অবলম্বন করেছেন, আজকের প্রেক্ষাপটে তা থেকে আমরা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, এটাই ছিল আমার এ প্রসঙ্গে আলোচনার মূল লক্ষ্য। মক্কায় প্রতিকূলতার ক্রমবর্ধমান তীব্রতা, অন্যান্য আরব গোত্রসমূহের দাওয়াতে সাড়া দানে ব্যর্থতার পাশাপাশি মদিনায় আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের ইসলাম গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার বিষয়টি ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দাবী রাখে বিধায় এর তিনটি পর্যায় নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা না করে পারলাম না। আর এ আলোচনার জন্যে মাওলানা মওদূদী (র.) প্রণীত সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থে পরিবেশিত ও উপস্থাপিত তথ্য সমূহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করে কৃতজ্ঞচিত্তে উক্ত কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

www.bjilibrary.com

আকাবার তিনটি বায়াত থেকে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা

মদিনার আনসার গোত্রের দুটি শাখা বনি আউস ও খাজরাজের পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর রেসালতের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট হবার কারণ এই নিবন্ধে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে তিনটি বায়াতের সময়ে লক্ষণীয় কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে চাই।

এক ঃ রাসূল (সা.) এর ভূমিকা ও তার তাৎপর্য।

দুই ঃ মদিনাবাসীর বক্তব্য ও তাদের আন্তরিকতা।

তিন ঃ হযরত আব্বাসের ভূমিকা।

এক ঃ মদিনা থেকে আগত প্রথম দলটির কাছে রাসূল (সা.) ইসলামের দাওয়াত পেশ করে তাদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা চাইলেন, তাদের সাথে যাওয়ার আগ্রহই মূলত: প্রকাশ করলেন, যেমনটি করেছেন অন্যান্য গোত্রের লোকদের কাছে। জবাবে মদিনাবাসী তাদের এলাকায় বিরাজিত যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি তুলে ধরে যে প্রস্তাব দিলেন, রাসূল (সা.) তার বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন।

পরবর্তী বছরে আগত প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণের পর তাদের সাথে দিয়ে দিলেন মুসয়াব বিন উমাইরকে দীন শিক্ষা দান ও দীনের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্যে। শেষ বায়াতে আকাবায় আগত লোকদের সাথে মদিনায় রাসূলকে (সা.) নিয়ে যাওয়ার আলাপটি চূড়ান্তরূপ পায়। এখানে রাসূলে পাক (সা.) তাদেরকে খোলামেলা আলাপ আলোচনার যে সুযোগ দেন তা খুবই লক্ষণীয়। রাসূল (সা.) এখানে কোন গোঁজামিলের আশ্রয় নেননি। অন্যান্য গোত্র রাসূলের (সা.) সাহায্য ও সহযোগিতার বিনিময়ে, জাগতিক ও বৈষয়িক সুবিধা চেয়েছে - নেতৃত্ব কর্তৃত্ব চেয়েছে। রাসূল (সা.) তাদেরকে এ সম্পর্কে সাফ বলেছেন, তার দাওয়াত এ জন্যে নয়। তার দাওয়াত কেবল আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তার রেজামন্দির জন্যে। ক্ষমতা প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দেবার মালিক আল্লাহ। মদিনাবাসীকে আল্লাহর রাসূল (সা.) অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম পেয়েছেন। তাই খোলামেলা সব বিষয় পরিষ্কার করে নিয়েছেন, ইসলাম

www.bjilibrary.com

কবুলের এবং রাসূল (সা.) কে আশ্রয় দেওয়ার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সহযোগিতা করার বিষয়টি যে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ, সমূহ বিপদের আশংকা আছে এতে। আছে গোটা আরববাসীর ক্রোধ আক্রোশের শিকার হবার পুরো ব্যাপারটি। আর এর বিনিময় হবে একমাত্র জান্নাত এবং জান্নাত।

দুই ঃ মদিনাবাসী যেহেতু ইয়াহুদীদের কাছ থেকে অতিশীঘ্র একজন নবীর আগমনের সম্ভাবনার কথা শুনে অভ্যস্ত ছিল তাই রাসূলের (সা.) মুখে কুরআন শুনে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে নিশ্চিত হন যে ইনিই সেই নবী যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ইয়াহুদীদের কাছ থেকে তারা এত দিন শুনে আসছে। তাই কালবিলম্ব না করে স্বত:স্ফূর্তভাবে, সন্তুষ্টচিত্তে রাসূলের (সা.) উপস্থাপিত ইসলামের উপর ঈমান আনেন। তারা রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে তাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত কওমের ঐক্য সংহতির আশাবাদও ব্যাক্ত করেন। সেই সাথে তাৎক্ষণিকভাবে রাসূল (সা.) কে মদিনায় নিয়ে না গিয়ে একটু সময় নেওয়ার কথা বলেন অকপটে।

দ্বিতীয় দফায় বায়াতের পর দীন শিক্ষার জন্যে এবং দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করার জন্যে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সাথে পাওয়ার আবদার করেন। রাসূল (সা.) নিজেও এমনটি চিন্তা করেন, যার নেতৃত্বে তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে মদিনায় ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় দফায় বায়াতে আকাবার আগে মদিনা থেকে মক্কায় আগমনের আগে তারা নিজেরা এ সংকল্প নিয়েই হজ্জে আসেন যে, রাসূল (সা.) কে মক্কায় এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না। তাকে মদিনায় নিয়ে আসতে হবে। তারপরও তারা কিন্তু বেশ সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। মুশরিকদের সাথে মিলে মিশেই এসেছেন। রাসূল (সা.) -এর সাথে সংগোপনেই দেখা করেছেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর সতর্কতামূলক নির্দেশনাবলী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই অনুসরণ করেছেন। আবার তাদের নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি যিনি তখন পর্যন্ত মুশরিক, তাকেও আস্থায় নিয়েছেন তার মধ্যে ইসলাম কবুলের সম্ভাবনা দেখে। সর্বোপরি রাসূল (সা.) সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বায়াত গ্রহণের আহবানে যে কথাটি বললেন-

"নিজেদের জান ও আওলাদের হেফাজত যেভাবে করে ঠিক সেভাবেই রাসূল (সা.) এর হেফাজতের দায়িত্ব তারা গ্রহণের অঙ্গিকার করবে।" এ

ব্যাপারে তাদের যে বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম সম্পর্কে জানার বোঝার সময় সুযোগ তারা এর আগে তেমন একটি পায়নি। এরপরও যে ঈমানী দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেছে তা অতুলনীয়। সেই সাথে রাসূল (সা.) কে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার কাজটি কতবড় ঝুঁকিপূর্ণ তার যথার্থ উপলব্ধিসহ, সারা দুনিয়ার পক্ষ থেকে লড়াইয়ের আশংকা সত্ত্বেও শুধু জান্নাতের বিনিময়ে সব কিছু হাসি মুখে বরণ করার যে সংকল্প তারা ঘোষণা করেন তা সত্যি ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।

তিন ঃ আকাবার সর্বশেষ বায়াতের আগে এবং পরে দুবার আমরা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। যদিও ঐ সময় পর্যন্ত তার ইসলাম কবুলের ব্যাপারটি গোপন ছিল। তিনি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর নিরাপত্তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দানকারীদের ভূমিকার কথা বলে, রাসূল (সা.) এর মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বলে তাকে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার আগে যেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেন এবং তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সাহস, হিম্মত, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার মোটামুটি একটা পরীক্ষা নিয়ে তাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেন; তা যেমন হযরত আব্বাসের (রা.) হৃদয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধের পরিচয় বহন করে, তেমনি পরিচয় বহন করে তার বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টিরও।

সর্বোপরি কথা রাসূল (সা.) এর নেতৃত্ব যে কতটা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শরীক করার ক্ষেত্রে তিনি যে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব, তার অগণিত নজীরের মধ্যে সর্বশেষ আকাবার প্রতিনিধিদের সমাবেশ পরিচালনার সার্বিক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মদিনায় ময়দান তৈরির কাজ

আমরা রাসূল (সা.) এর মক্কার জীবন শীর্ষক এই আলোচনার শুরুতে মক্কী ও মাদানী অধ্যায়ের পরিচয় এভাবে পেশ করেছিলাম; মক্কী অধ্যায় ব্যক্তি গঠন বা সংগ্রাম যুগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আর মাদানী অধ্যায়কে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন বা বিজয় যুগ নামে অভিহিত করতে পারি। ঈমানের

www.bjilibrary.com

অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে কাফের মুশরিকদের অবর্ণনীয় জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে খাঁটি মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয় দীর্ঘ তের বছরের মক্কী অধ্যায়ের চরম প্রতিকূল পরিবেশে। আর মদিনা থেকে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত আনসার গোত্রের লোকদের তিন পর্যায়ে রাসূল (সা.) এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগে তার কাছ থেকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত ও কুরআনের সাথে পরিচিত হবার সুবাধে মদিনার জমিন তৈরী হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীন উপনীত হয় বিজয়ের দ্বার প্রান্তে। সর্বশেষ বায়াতে আকাবার পর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মদিনায় ফিরে যান আনসার গোত্রের প্রতিনিধি দল। সুশৃংখল ও সুসংগঠিতভাবে ইসলামী সমাজ গঠনের এই কাজকে সফলরূপ দানের জন্যে রাসূল (সা.) মদিনাবাসীদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব (নেতা) ঠিক করে দেবার প্রস্তাব দিতে বললেন। যেমন মুসা (আ.) বনি ইসরাইল থেকে ১২ জন নকীব নিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) ১২ জন নকীব বাছাইয়ের দায়িত্ব মদিনাবাসীকে অর্পণ করে মূলতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে শরীক করেন এবং স্বাধীনভাবে বিচার বিবেচনার সুযোগ দেন। তিনি একথাও বলেন যে, ঈসা (আ.) ইবনে মরিয়মের জামিনদার হয়েছিলেন হাওয়ারীগণ। আউস, খাজরাজ গোত্র দুটির সংখ্যার দিকে খেয়াল রেখে রাসূল (সা.) সেই অনুপাতে খাজরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আউস থেকে ৩ জন বাছাই করার নির্দেশ দেন। এখানে আমরা যুগপৎভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ইনসাফের বাস্তব নমুনা দেখতে পাই। উল্লেখিত বার জন নকীবের নাম নিম্নরূপ ঃ-

খাজরাজ থেকে

১। আসায়াদ বিন যুরারা (রা.) নকীবদের নকীব।

২। সা'দ বিন আর বাবী (রা.) জাহেলী যুগে মদিনায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি।

৩। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)। তিনি মদিনায় একজন কামেল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৪। রাফে বিন মালেক (রা.)। তিনি জাহেলী যুগে একজন কামেল ব্যক্তি হিসেবে নন্দিত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

৫। বারা বিন মা'রুর (রা.)। হিজরতে কিছু পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.)। বায়াতের আকাবার রাতে তিনি ঈমান আনেন।

৭। ওবাদা বিন সামেত (রা.)

৮। সা'দ বিন উবাদা (রা.)। তাকেও কামেল বলা হত।

৯। মুনয়েম বিন আমর (রা.)। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত লোক।

আউস গোত্র থেকে

১০। উসায়েদ বিন খুযাইর (রা.)। তাকে কামেল বলা হত।

১১। সা'দ বিন খায়সামা (রা.)

১২। রিফায়া বিন আব্দুল মুনযের। মতান্তরে আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান।

অতপর হুজুর (সা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতসহ সামগ্রিক শিক্ষা প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজ নিজ জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এখানে কতিপয় বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ-

রাসূলে পাক (সা.) মদিনা থেকে আগত এই লোকদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করলেন, সে দায়িত্বের গভীরতা সম্পর্কে তাদেরকে পুরোপুরি সজাগ ও সচেতন করে নেন। উক্ত দায়িত্ব পালনে তাদের মধ্যে যেন ন্যূনতম দ্বিধা সংশয়ও না থাকে সে জন্যেও তাদেরকে মানসিক ও মনস্তাত্বিকভাবে প্রস্তুত করার বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে লোকদেরকে তৈরী করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদেরকে শরীক করার বিষয়টি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরামর্শে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শরীক করার নির্দেশ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এ জন্যেই দিয়েছেন, ঈমানদাদের অন্যতম বৈশিষ্ট পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করার কথাটিও কুরআনে এ জন্যেই উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) তৃতীয় বায়াতে আকাবার মূহুর্তে মদিনাবাসীকে এজন্যে কথা বলার

www.bjilibrary.com

সুযোগ দিয়েছেন। বায়াত শেষে মদিনায় দীনের দাওয়াত, তাবলীগ ও দীন প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব সঠিক ও কার্যকরভাবে আনজাম দেওয়ার জন্যে যে নকীব নিয়োগ করলেন, সে ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত দেওয়ার সুযোগ দিলেন। যা সর্বকালে সর্বযুগের আদর্শ শাসক ও সংগঠকের জন্যে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

নিজ নিজ এলাকার জন্যে সুযোগ্য ও যথার্থ ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষ মাফকাঠিতে, জ্ঞানে গুণে ও প্রজ্ঞায় সর্বোত্তম ব্যক্তি বাছাই করার ক্ষেত্রে মদিনাবাসীর ভূমিকাও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের এই বিবেক বুদ্ধি ও বাছ-বিচারের দক্ষতা সত্যিই অতুলনীয়। সম্ভবতঃ এজন্যেই মুহাম্মদ (সা.) এর দীনের বিজয়ের পর্বটিকে পূর্ণতা দানের জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই ভাগ্যবান লোকদেরকেই বাছাই করেন। খাজরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আউস গোত্র থেকে যে ৩ জন বাছাই করা হল স্ব-স্ব গোত্রের লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্ব বিচারে ইনসাফের দৃষ্টিতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তারাই ছিলেন উত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাছাড়া উপস্থিত লোকদের বাইরেও মদিনার বৃহত্তর সমাজে তাদের ছিল স্বত:স্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতা। তাদের সবাইকে তদানীন্তন মদিনার সমাজে স্বাভাবিক নেতা বা সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হত।

মক্কায় চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সাথে মদিনার এই প্রজ্ঞাবান মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের সমন্বিত শক্তি সোনায় সোহাগা প্রমাণিত হয়। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সর্বোত্তম ত্যাগ, কুরবাণী ও ঝুঁকি নিয়ে প্রতিপক্ষের বাধা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলার ফলেই রাসূল (সা.) এর সফল নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইতিহাসের সর্বোত্তম মানব সমাজ।

হিজরত পূর্ব কুরআনী নির্দেশনা

রাসূল (সা.) এর ঘটনাবহুল ও সংগ্রামমুখর মক্কার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে। তার আন্দোলন সংগ্রামযুগের নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে উপনীত হয় বিজয় যুগে। রাসূল (সা.) এর মক্কার জীবনের সর্বশেষ ঘটনা হিজরাত। আবার এই হিজরাতই হল মাদানী

www.bjilibrary.com

জীবনের সূচনাপর্ব। অতএব আমরা হিজরাতের আলোচনা একটি আলাদা অধ্যায়েই করতে চাই। তার আগে মক্কার জীবনে শেষ তিন বছরের মক্কার প্রতিকূলতা এবং মদিনার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার প্রিয় নবীকে যেসব দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার উপর অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। মক্কী অধ্যায়ের এই পর্যায়ে আল কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াত নাজিল হয়েছে তার সবটাই অর্থবহ প্রণিধানযোগ্য এবং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। আমরা নিজেরা ঐ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তা অধ্যয়ন করলেই তার মর্ম ও বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

মক্কী অধ্যায়ের সর্বশেষ স্তরে অবতীর্ণ সূরায়ে আনয়ামের সবটাই আসন্ন প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক হেদায়াতে ভরপুর, আমরা এ সূরা থেকে মাত্র চারটি অংশের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মক্কার কাফেরদের চরম বিরোধিতায় অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানদারদের অনেকের মনে দ্রুত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অলৌকিক সাহায্যের প্রত্যাশা অস্থিরতার জন্ম দেয়। এহেন মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা যে হেদায়াত প্রদান করেন তা নিম্নরূপ ঃ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ - وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ - إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

"(হে মুহাম্মদ!) আমি জানি তারা যে সব বানোয়াট কথাবার্তা বর্ণনা করে, তাতে তোমার দু:খ হয়, তুমি কষ্ট পাও। কিন্তু জেনে রাখ, এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, প্রকৃত পক্ষে এই জালেমরা আল্লাহর আয়াত বা

www.bjilibrary.com

নিদর্শনাবলীই অস্বীকার করছে। তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরও এভাবেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, অস্বীকার করা হয়েছে। তাদেরকে যে সব জ্বালা-যন্ত্রণা করা হয়েছে, তার উপর তারা ধৈর্যধারণ করেছেন। অত:পর তারা আমার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহর এই বাণী এবং বিধানের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনের শক্তি কার নেই। অতীতের নবী রাসূলদের ইতিহাস সম্পর্কে তো অবহিত করাই হয়েছে। তাদের এই বৈরী আচরণ যদি তোমাদের সহ্য না হয়, তাহলে পারলে জমিনে কোন সুরঙ্গ পথ তালাশ কর, অথবা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমান থেকে নিদর্শন নিয়ে আনার চেষ্টা করে দেখতে পার। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তাদের সবাইকে হেদায়েতের উপর একত্রিত করতে পারতেন। অতএব অজ্ঞ মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সত্যের দাওয়াতে তারাই সাড়া দিতে সক্ষম হয় যারা (মনোযোগের সাথে) সত্যকে শুনতে প্রস্তুত। আর যারা মৃত (বিবেকহীন) তাদেরকে তো কবর থেকেই উঠানো হবে।" (সূরা আল আনয়াম ৩৩-৩৬)

তদানীন্তন আরব বিশ্বের মুশরিক, ঈসায়ী ও ইয়াহুদীদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হযরত ইব্রাহীম (আ.), শিরকের বিরুদ্ধে তার ভূমিকাকে আল্লাহ তুলে ধরেছেন এভাবে;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ - فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

www.bjilibrary.com

"স্মরণ কর ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনা। যখন তিনি তার পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলোকেই আপনার খোদা বানিয়ে নিচ্ছেন। আমি তো আপনাকে এবং আপনার কওমকে প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। আমি এভাবেই ইব্রাহীমকে (আ.) আসমান জমিনের যাবতীয় রহস্য পর্যবেক্ষণ করিয়েছি। যাতে করে তিনি পূর্ণ একিনের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। অতএব যখন তার জন্যে রাত ঘনিয়ে এল এবং তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন বললেন, এই আমার রব। কিন্তু যখন সে তারকা ডুবে গেল তখন বলে উঠলেন, আমি এভাবে ডুবে যাওয়া কোন কিছু পছন্দ করিনা। এরপর যখন চাঁদের ঔজ্জ্বল্য দেখলেন তখন বললেন, এটাই আমার রব, কিন্তু চাঁদ ডুবে গেল, তখন বললেন, আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমিও পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অতপর যখন সূর্য্যের রোশনি দেখলেন, এটা আমার রব এটা সবচেয়ে বড়। অত:পর এটি যখন অস্ত গেল তখন তিনি বললেন, হে আমার কওমের লোকেরা তোমরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরীক কর আমি সেসব থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমি তো একনিষ্ঠ চিত্তে ধাবিত হচ্ছি সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি কখনও শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আল আনয়াম ৭৪-৭৯)

তওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জনের মাধ্যমে যে ইসলামী সমাজ গড়ে উঠবে আর অল্প কিছু দিন পরেই সেই সমাজের মৌলিক বিধানের প্রাথমিক ধারণাও দেওয়া হয়েছে এই পর্যায়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন;

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ – وَأَنَّ هَذَا

www.bjilibrary.com

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ -

"হে মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে বলে দাও, আস, আমি তোমাদের এই মর্মে অবহিত করি যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কি কি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

১। এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

২। পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।

৩। দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরও রিজিকের ব্যবস্থা করি এবং তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করি।

৪। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন অশ্লীলতার ধারে কাছেও যাবে না।

৫। অন্যায়ভাবে কারো জীবননাশ করবে না, আল্লাহ যাকে পবিত্র এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তোমরা যাতে বুঝে শুনে চলতে পার এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই হেদায়াত তোমাদেরকে দান করেছেন।

৬। বিধি সম্মত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া ইয়াতিমের মালের ধারে কাছেও যাবেনা। (আর যদি বিধি সম্মতভাবে দায়িত্ব নেওয়া হয়) তাহলে তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্তই হবে তার সময় সীমা।

৭। ওজনের ব্যাপারে ন্যায় ইনসাফ সমুন্নত রাখ। আমরা মানুষের উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা বা দায়িত্বভার অর্পন করিনা।

৮। আর যখন কথা বলতে হয় ন্যায় ইনসাফের ভিত্তিতে কথা বলবে। এমনকি যদি কোন নিকট আত্মীয়দের বিপক্ষেও যায়।

৯। এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা কর। তোমরা যাতে উপদেশ গ্রহণে সক্ষম হও এজন্যেই এই হেদায়াত প্রদান করা হল।

১০। আর নিশ্চিত হও এটাই আমার নির্ধারিত সরল সঠিক পথ। তোমরা এ পথেই চল, অন্য কোন পথ ও পন্থা অনুসরণ করবেনা। (এমনটি করলে)

www.bjilibrary.com

তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিক ভ্রান্ত করে ছাড়বে। আল্লাহ তায়ালার এই নছিহত তোমাদেরকে সকল প্রকারের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষা কবজ স্বরূপ।" (সূরা আল আনয়াম ১৫১-১৫৪)

আল্লাহ প্রদত্ত এই সত্য-ন্যায়ের পথের যথার্থতার উপর সুদৃঢ় আস্থাই ছিল তখনকার পরিস্থিতির দাবী, সেই সাথে এ ঘোষণারও প্রয়োজন ছিল যে এটা মুহাম্মদের কোন নতুন সৃষ্টি করা পথ নয়, আরবের মুশরিক ও আহলে কিতাব (ইসায়ী ও ইয়াহুদী) সকলের আদি পিতা ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ইব্রাহীমও (আ.) এ পথেরই অনুসারী ছিলেন। সেই সাথে এ ঘোষণাও প্রয়োজন ছিল যে, এক আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি ছাড়া পার্থিব কোন স্বার্থই এ পথের পথিকদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। আল্লাহ তায়ালার এই পর্যায়ের হোদায়াত;

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ـ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! বলে দাও, আমার রব (আল্লাহ) আমাকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। পরিপূর্ণ সত্য দীন যাতে কোন বক্রতা নেই। এটা তো ইব্রাহীম (আ.) এর পথ ও পন্থা যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বল, আমার নামাজ, আমার কুরবাণীসহ যাবতীয় বন্দেগী, আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছু সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে যার কোন শরীক নেই। এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট। আর সবার আগে আমি তার অনুগত বান্দা হিসেবে তার দরবারে আত্মসমর্পনকারী।"

(সূরা আল আনয়াম ১৬১-১৬৩)

মক্কা থেকে মদিনায় রাসূলের (সা.) সাহাবীগণের হিজরত পর্যায়ক্রমে শুরু হয়ে যায়। খোদ রাসূল (সা.) আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়। তার জন্যে মদিনার স্টেজ তৈরী প্রায়, এমন সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত আঘাত

www.bjilibrary.com

হানার চিন্তাভাবনা করতে থাকে। তারা সলাপরামর্শ করতে থাকে, মুহাম্মদকে (সা.) তারা কি হত্যা করবে, না কোথাও বন্দি করে রাখবে। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নাজিল করেন আহসানুল কাছাছ সূরায়ে ইউসুফ। হযরত ইউসুফের (আ.) ভাইদের যে আচরণে ইউসুফ (আ.) কে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হতে হয়। বণিকদের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া গোলাম হিসেবে মিশরের বাদশাহর দরবারে আশ্রয় পাওয়ার পর হতে হয় জঘন্য চক্রান্তের শিকার। আল্লাহ তায়ালা তার এই প্রিয় নবীকে নিস্পাপ জীবনের হেফাজতে সাহায্য করেন। তিনি জেল জীবন পছন্দ করলেন কিন্তু চরিত্র বিসর্জন দিলেন না। কারাবন্দী অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফকে (আ.) তৌফিক দিলেন রাজদন্ডের অধিকারী হবার। তার জীবননাশের ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের কাছে ফিরে গেলেন পূজনীয় হিসেবে এবং তাদের প্রতি ঘোষণা করলেন ক্ষমা। পুরা সূরাটাই রাসূল (সা.) এবং তার সাথীদের জন্যে সবর ও ইস্তেকামাতের ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস এবং সেই সাথে নিকট বিজয়ের সম্ভাবনার হাতছানি।

সূরায়ে ইব্রাহীম এবং সূরায়ে হিজরও এই পর্যায়ে নাজিল হয়। আমরা সব সূরার বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা এই নিবন্ধে আনতে পারবনা। আমি এরপর সূরায়ে নহলের বিষয় বস্তুর প্রতি সিরাতে রাসূলের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সূরায়ে "আনয়াম ও সূরায়ে নহলের" নজুলের সময়কাল প্রায় কাছাকাছি। এ সূরায় শিরকের অসারতা ও যুক্তিহীনতা প্রমাণ করে তওহিদের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই সাথে নবীকে অস্বীকার করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং হকের বিরোধিতার ও এ পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কুফল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

মক্কার কাফের মুশরিকগণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বলতে থাকে আমরা এত প্রকাশ্যে নবীকে প্রত্যাখ্যান করছি, তার বিরোধিতা করছি, কৈ তবুও কেন এখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আযাব আসেনা, যে আযাবের তোমরা আমাদেরকে ভয় দেখাও। এটাকেই তারা মুহাম্মদ (সা.) এর নবী না হওয়ার দলিল মনে করে বার বার পূনরাবৃত্তি করতে থাকে। তাদের জবাবে বলা হয়, নির্বোধ লোকেরা, আল্লাহর আযাব তো তোমার মাথার উপর অপেক্ষমান। যে কোন মুহূর্তে যা আপতিত হতে পারে। এটাকে এভাবে

www.bjilibrary.com

কামনা করনা। আল্লাহ কিছুটা অবকাশ দিয়েছেন সেই সুযোগটা গ্রহণ করে প্রকৃত সত্য অনুধাবনের চেষ্টা কর। এভাবে সত্য উপলব্ধি করানোর লক্ষ্যে এই হেদায়াত প্রদানের সাথে সাথে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করতে পারি এ সূরায় শিক্ষনীয় দিক নির্দেশনা রূপে।

১। গোটা সৃষ্টি লোকের (আফাক ও আনফুস) সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের চিত্তাকর্ষক বর্ণনার মাধ্যমে শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা যেমন প্রমাণ করা হয়েছে তেমনি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তওহিদের যথার্থতা যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা।

২। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের প্রত্যাখ্যানকারী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের যাবতীয় অভিযোগ, সন্দেহ সংশয়, যুক্তি ও বাহানা সমূহের এক এক করে জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩। সত্যের মোকাবিলায় গর্ব অহংকার প্রদর্শনের এবং বাতিলের উপর বহাল থাকার হঠকারী কার্যক্রমের কুফল ও অশুভ পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে ভয় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪। মুহাম্মদ (সা.) আনীত দীন মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে যে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে চায় তার অতি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মুশরিকদেরকে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহকে রব মানার যে দাবী তারা করে থাকে তা শুধু মাত্র অর্থহীনভাবে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং এ ঘোষণার কিছু অন্তর্নিহীত দাবীও আছে। মানুষের বিশ্বাসে, নৈতিকতায় ব্যবহরিক জীবনে যার প্রতিফলন ঘটতে হবে। এ সূরার ৯০ নম্বর আয়াতটি এ ক্ষেত্রে নতুন আংগিকে উপলব্ধি করা আমাদের সকলের হৃদয়কে ও বিবেককে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হতে পারে যাতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ আদল, ইহসান এবং সেলায়ে রেহমীর (আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা) নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও জুলুম এবং সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে বলছেন, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে করে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।"

৫। একদিকে যেমন নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তার প্রিয় সাথী সঙ্গীদের মনোবল ও প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদেরকে দীনের মৌলিক দাওয়াত হিকমত এবং মাওয়াজে হাসানার সাথে অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি এর সাথে সাথে কাফের মুশরিকদের বিরোধীতা, তাদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা বাধা প্রতিবন্ধকতা এবং নির্যাতন ও নিপীড়নের মোকাবিলায় কি ভূমিকা পালন করা আল্লাহ পছন্দ করেন তাও বুঝিয়ে বলা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগময়ী নির্দেশনার মাধ্যমে। এই সূরার শেষ তিনটি আয়াত এই আলোচনার আলোকে আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলে তা সকলের অন্তরকেই স্পর্শ করবে এক স্বর্গীয় অনুভূতিসহকারে। আল্লাহ তায়ালার এই পর্যায়ের হেদায়াত;

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ - وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ - إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ -

"হে নবী তোমার রবের প্রতি দাওয়াত দাও বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে। আর লোকদের সাথে বিতর্কের অবস্থা হলে তাতে অংশ নেবে উত্তম ও মার্জিত উপায়ে। কে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত আর কে সঠিক পথে আছে এ বিষয়ে তোমার রবই বেশী ওয়াকেফহাল। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তাহলে ঠিক ততটুকুই নিতে পার যতটুকু

www.bjilibrary.com

অন্যায় তারা করেছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর কর, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখ সেটা সবরকারীদের জন্যেই হবে কল্যাণকর। হে মুহাম্মদ, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথেই কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের এ সবর বা ধৈর্যে সহনশীলতা আল্লাহ প্রদত্ত তওফিকের ফল। তাদের (কাফের মুশরিকদের) ব্যবহারে দুশ্চিন্তা করো না, তাদের কূটকৌশলের কারণে নিজেদের জন্যে আল্লাহর এ জমিনকে সংকীর্ণ ভেবনা। আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদের সহায়, যারা তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করে এবং ইহসান বা যত্ন ও মুহাব্বতের সাথে দায়িত্ব পালন করে।" (সূরা আন নহল ১২৫-১২৭)

সূরায়ে বনি ইসরাইলও এই প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা যেহেতু মিরাজের প্রসঙ্গে এ সূরার বিষয়বস্তু মোটামুটি আলোচনা করে এসেছি, অতএব এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছিনা পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে। অনুরূপভাবে কুরআন অধ্যয়নকালে মক্কী অধ্যায়ের সর্বশেষ স্তরে বাকী তিন বছরে আল্লাহ সুবাহনাহু তায়ালা যেসব সূরা ও আয়াত নাজিল করেছেন তার আলোকে বর্তমান বিশ্বের ঐসব দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীগণ বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনা ও কর্মকৌশল উদঘাটনে সক্ষম হবেন, যাদের দেশে ইসলামী আন্দোলন একটি সিদ্ধান্তকারী পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাধাপ্রতিবন্ধকতা যেমন একদিকে আল্লাহর এ প্রশস্ত জমিনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে, বিপর্যয়ের আশংকা অনেকের মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জন্ম দিচ্ছে, তেমনি আবার হাতছানী দিচ্ছে সাফল্যের সোনালী সম্ভাবনারও। অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে বিপর্যয়, মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সেসব অবস্থার পর্যালোচনাও হতে পারে কুরআনী হেদায়েতের আলোকে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

"অতঃপর দুঃসময়ের পরেই আসবে সুসময়, সন্দেহ নাই দু:সময়ের পরেই আসবে সুসময়।"

আল্লাহর এই আশ্বাসবাণীকে সম্বল করে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলাই হিকমতের দাবী। প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়াই ঈমানের দাবী যার অপর নাম সবর। এ জন্যেই ঈমানের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, আল ঈমানু আস্‌সাবর ওয়াস্‌সামাহাত। ঈমান

www.bjilibrary.com

হল মূলত: ধৈর্য, সহনশীলতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার নাম। সূরায়ে নহলের শেষ তিনটি আয়াতে আমরা দেখলাম। দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত ও উত্তম উপদেশের পর সবরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শর্ত সাপেক্ষে প্রতিবাদ প্রতিশোধের অনুমতি দিলেও সবরকেই আল্লাহর পছন্দনীয় এবং আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে যদি সবর কর তো সেটা সবরকারীর জন্যে উত্তম। তারপর জোর দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবর কর। তোমার সবরের সাথে রয়েছে আল্লাহ ও তার সাহায্য।

www.bjilibrary.com

(৯)

মদিনায় হিজরত

আকাবার তৃতীয় বায়াতের পর রাসূলের (সা.) আন্দোলন একটি সিদ্ধান্ত কারী অধ্যায়ে পদার্পণ করে। সম্ভাবনা, স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এ আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার। রাসূল (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় পৌঁছলেই যা পাবে চূড়ান্ত রূপ। তৃতীয় বায়াতে আকাবায় শরীক আনসার গোত্রের (খাজরাজ ও আউস) লোকেরা রাসূলের (সা.) কথা শুনে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করে দারুণভাবে উজ্জীবিত হন। পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ফিরে যান নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসারের সংকল্প নিয়ে। সেই সাথে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান এ জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ কুরবানীর জন্যে; যে কোন ঝুঁকির মোকাবিলা করার বলিষ্ঠ সংকল্প নিয়ে। এর বাস্তব ফল কী হতে পারে মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। তাই তারা যখন এই ঘটনা জানল তখন যুগপৎভাবে বিক্ষোভে যেমন ফেটে পড়ল, তেমনি মনে মনে দারুণ হতাশাও পেয়ে বসল তাদেরকে। প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে তারা মদিনাবাসীর শিবিরে পৌঁছে গেল তাৎক্ষণিকভাবে।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মদিনা শিবিরে (মিনায়) পৌঁছে গেল এবং বলল, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা মুহাম্মদের সাথে মিলিত হয়েছ। তাকে তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছো। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছো। সেই সাথে তারা এও বলল, খোদার কসম আরবের কোন কওমের সাথে যুদ্ধ করা আমরা তোমাদের চেয়েও বেশি অপছন্দ করি।

www.bjilibrary.com

তাদের প্রশ্নের উত্তরে মদিনাবাসীদের শিবিরে উপস্থিত মুশরিকদের যেহেতু কিছুই জানা ছিল না, তাই তারা হলফ করে বলে দিল এমন কিছু আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে যখন বলা হল, সে বলল, এতবড় কাজ আমার কওমের লোকেরা আমাকে না জানিয়ে করতে পারে না। মুসলমানরা এই সময়ে নীরবতা অবলম্বন করে সঙ্গত কারণেই। তবে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই সব জবাবে খুশি হতে পারেনি। পরে তারা আরো খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হয় যে, এমন কিছু অবশ্যই ঘটেছে।

বায়াত গ্রহণকারীগণ হজ্জ শেষে মদিনার দিকে রওয়ানা করলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের পিছু নেয় এবং পথের মধ্যে সা'দ বিন ওবাদা (রা.) ও মুনযের বিন আমরকে (রা.) ধরে ফেলে। মুনযের তাদের হাত থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু সা'দ বিন ওবাদাকে (রা.) আটক করে মক্কায় নিয়ে যায়। তার হাত গলার সাথে বেঁধে তাকে মারতে থাকে। মক্কায় পৌঁছার পর এক যুবক তাকে সজোরে ঘুষি মারে। এভাবে এক পর্যায়ে যখন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আবুল বাখতারী বিন হিশাম নামক একজন কুরাইশ নেতার মনে কিছুটা মানবিক ভাব জেগে উঠে। সে সা'দ বিন ওবাদা (রা.) কে বলল, "কুরাইশদের কারো সাথে তোমার কোন প্রতিশ্রুতি বা আশ্রয়ের সম্পর্ক নেই তো?" এর উত্তরে হযরত সা'দ বিন ওবাদা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি আমার এলাকার জুবাইর বিন মুতয়েম ও হারেস বিন যাবার বিন উমাইয়া বিন আবদে শামসের বাণিজ্যিক কাফেলাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। এরপর আবুল বাখতারী বিন হিশাম তাকে পরামর্শ দিল "তুমি তাদের দোহাই দাও এবং তাদের দুজনের সাথে তোমার সম্পর্কের কথা জানাও। সা'দ বিন ওবাদা অতঃপর তাই করলেন। তখন আবুল বাখতারী নিজেই ঐ দুব্যক্তির তালাশে বেরিয়ে গেল। হারাম শরীফে তাদের পেয়ে ঘটনা জানিয়ে বলল, মক্কায় এবং মিনার মধ্যবর্তী মহাসসার উপত্যকায় খাজরাজের এক ব্যক্তিকে মারপিট করা হচ্ছে, সে তোমাদের দুজনের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তার দাবী, তোমাদের দুজনের সাথেই নাকি তার আশ্রয়ের সম্পর্ক আছে। তখন তারা দুজনে ঐ ব্যক্তির নাম জানতে চাইল। উত্তরে বলা হল তার নাম হল সা'দ বিন ওবাদা। একথা

www.bjilibrary.com

শুনে তারা দুজনেই বলল, সে ঠিকই বলেছে। আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে সে আশ্রয় দিত এবং কারো উপর কাউকে জুলুম করতে দিত না। অতঃপর ঘটনাস্থলে এসে সা'দ বিন ওবাদাকে (রা.) উদ্ধার করল।

আনসার গোত্রের অন্যান্য লোকেরা পথিমধ্যে জানতে পায় যে, সা'দ বিন ওবাদা (রা.) কে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তারা আবার মক্কায় ফিরে আসতে থাকে এবং পথেই হযরত সা'দ বিন ওবাদার (রাঃ) দেখা পান এবং এক সাথে মদিনায় ফিরে আসেন।

তৃতীয় বায়াতে আকাবা থেকে ফিরে গিয়ে আনসার গোত্রের লোকেরা মদিনায় অত্যন্ত জোরে শোরে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে মনের ষোল আনা আবেগ অনুভূতি নিয়ে। তওহিদের আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে। সেই সাথে ঐ সব ক্ষেত্রে তারা বর্জন শুরু করে, শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম। নবী মুহাম্মদকে (সা.) মদিনায় নিয়ে আসার এবং তার দীন কায়েমের কাজে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যে অঙ্গীকার করে আসে তৃতীয় বায়াতে আকাবার মাধ্যমে তার সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্র তৈরির কাজ তারা শুরু করে দেয় মদিনা ফিরার সাথে সাথেই।

অপর দিকে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাথীদের উপর মরণ আঘাত হানার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। এই সময় মক্কা থেকে মদিনায় মুসলমানদের হিজরাত করে যাবার সাধারণ নির্দেশ আসে রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে। পর্যায়ক্রমে মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়া শুরু করে। আর মুশরিকরা পদক্ষেপ নিতে থাকে তাদেরকে হিজরাত থেকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। আকাবার শেষ বায়আতের পর নবুওয়াতের ১৩তম বছরে জিলহজ্জ মাসে নবী মুহাম্মাদ (সা.) মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভাই জোগাড় করে দিয়েছেন এবং এমন একটি নগরী ঠিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা

www.bjilibrary.com

নিরাপদে থাকতে পারবে। রাসূলের (সা.) এই নির্দেশের পর মজলুম মুসলমানদের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে প্রথম মুহাজির পরিবারের একটি করুণ ও মর্মস্পর্শী ঘটনা আমরা আলোচনা করতে চাই, সে সময়ের পরিস্থিতির সম্যক অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্যে।

হাবশায় হিজরাতকারীদের একজন হযরত আবু সালামা (রা.) দ্বিতীয় বায়াতে আকাবার পরপরই মদিনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ হাবশা থেকে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করা তার জন্যে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। মক্কার কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে তিনি যেমন নিগৃহীত হচ্ছিলেন, তেমনি নিপীড়নের শিকার হচ্ছিলেন নিজের গোত্রের লোকজনের পক্ষ থেকেও। কিন্তু জালেমরা তাকে স্বাভাবিকভাবে মক্কা ত্যাগ করতে না দিয়ে তার উপর চালায় অমানবিক নির্যাতন। তারিখে ইবনে হিশাামে আবু সালামার স্ত্রী হযরত উম্মে সালামার উদ্ধৃতি দিয়ে যে করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ আমরা উল্লেখ করছি। “হযরত আবু সালামা হিজরাতের উদ্দেশ্যে উটের উপর সাওয়ার হন তার স্ত্রী উম্মে সালামা ও শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে। উম্মে সালামার পিতৃকুলের পক্ষ থেকে এতে বাধা প্রদান করে বলা হল আবু সালামা তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। কিন্তু আমাদের পরিবারের মেয়ে ও তার শিশুকে নিয়ে এভাবে যেতে দেওয়া যায় না। তারা জোর পূর্বক উম্মে সালামাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অপর দিকে আবু সালামার পরিবারের লোকেরা তাদের পরিবারের শিশুকে নিয়ে যায় উম্মে সালামার কাছ থেকে। এভাবে একটি অমানবিক দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয় দুই বৈরী পরিবারের পক্ষ থেকে। সুতরাং স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই আবু সালামা মদিনায় হিজরাত করতে বাধ্য হন। আর স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দুর্বিসহ অবস্থায় পড়ে যান উম্মে সালামা (রা.)। এ অবস্থায় কেটে যায় প্রায় এক বছর। তিনি প্রায়ই আবতাহ্ নামক স্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন এবং কান্না-কাটি করতেন। অবশেষে বনি মুগীরার এক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে তিনি এ দুঃসহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পান এবং শিশু পুত্রকে সাথে নিয়ে একাই উটে চড়ে মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথে

www.bjilibrary.com

একজন হৃদয়বান ব্যক্তি ওসমান বিন তালহা বিন আবি তালহার সাথে দেখা হয়ে যায়। তিনি উম্মে সালামাকে তার গন্তব্যস্থলের কথা জিজ্ঞেস করেন। উম্মে সালামাকে এভাবে একাকী মদিনা যাওয়ার ঘটনায় তার হৃদয়ে সহানুভূতির সৃষ্টি হল। তিনি স্বয়ং তাকে মদিনায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিলেন। উটের নাকরশি হাতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি উম্মে সালামাকে নিরাপদে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে পুনরায় পায়ে হেটে মদিনায় ফিরে আসেন। এ মহান ব্যক্তি ছিলেন কাবার চাবি রক্ষক, বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকাবাহী। তিনি তখন পর্যন্ত ঈমান তো আনেনইনি বরং তার চাচাতো ভাই মুসয়াব বিন উমাইর ইসলাম কবুল করলে তার উপরে জুলুম নির্যাতন চালান। তিনি উম্মে সালামা (রা.) এর কোন আত্মীয়ও ছিলেন না। অবশ্য হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে হিজরত করেন। এখানে লক্ষণীয়, মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেই অসাধারণ মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে কারণে ঈমান না এনেও অনেকে মুসলমানদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে।

রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে সাধারণ হিজরাতের নির্দেশ আসামাত্র সর্বপ্রথম হিজরাত করেন রাবিয়া আল আনযী (রা.) ও তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমা (রা.)। এরপর হিজরাত করেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.) ও হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা.)। অতঃপর হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (রা.) তার বিবি রুকাইয়া (রা.) বিন্তে রাসূলকে নিয়ে রওয়ানা হন। এভাবে একের পর এক চলতে থাকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের পালা। কোন কোন পরিবারের সকল লোকজনই বেড়িয়ে পড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে। মাত্র দুটি পরিবার থেকেই হিজরাতে শামিল হন ৩০ জন। তাদের চলে যাওয়ার পর উতবা বিন রাবিয়া, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জেহেল ঐ দিক দিয়ে যাবার পথে শুনতে পেল, উতবা বিন রাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলছে বনি জাহশের বাড়ী শূন্য হয়ে গেল? আবু জেহেল টিপ্পনী কেটে বলল, কাঁদছ কেন? এসব তো আমাদের এ ভাইয়ের (আব্বাসের) ভাতিজার কর্মকাণ্ডের ফল।

www.bjilibrary.com

কুরাইশদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের মদিনায় নিরাপদে যেতে দিলে তারা মদিনাবাসীর সহযোগিতায় এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই মক্কা থেকে মদিনায় যাতে তারা যেতে না পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হযরত সুহাইব (রা.) যখন হিজরাতের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন তখন কুরাইশগণ তাকে বাধা প্রদান করে এবং বলে তোমার জানের সাথে মালও নিয়ে যাবে এটা হতে পারে না। এ সময়ে হযরত সুহাইব (রা.) তাদেরকে বললেন, আমি যদি আমার সমুদয় মাল-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে? তারা বলল, হ্যা। অতঃপর হযরত সুহাইব (রা.) তার সমুদয় ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে শূন্য হাতে বিদায় নিলেন। বেড়িয়ে পড়লেন আল্লাহর পথে। এ খবর শুনে হুজুর (সা.) মন্তব্য করলেন সুহাইব মুনাফার সওদা করেছে, সুহাইব মুনাফার সওদা করেছে।

হযরত ওমর (রা.) অন্যান্যদের মত গোপনে বের না হয়ে প্রকাশ্যে বিশ জন আরোহীসহ রওয়ানা হন। এ কাফেলায় মক্কা থেকে কিছু দূরে গিয়ে আরো কয়েকজনের শরীক হবার কথা ছিল। তার একজন হিশাম বিন আস মক্কাতেই কুরাইশদের হাতে আটক হন। অপরজন আইয়াশ বিন আবি রাবিয়া মদিনা পর্যন্ত গিয়ে আবু জেহেলের প্রতারণার শিকার হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলে চরম জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়। আবু জেহেল ও তার অপর ভাই মিলে তাকে রশি দিয়ে বেধে শাস্তি দিতে দিতে মক্কায় নিয়ে যায় এবং মক্কাবাসীকে বলে তোমাদের অবাধ্য ছেলেদেরকে এভাবে সোজা কর, যেভাবে আমরা একে সোজা করছি।

নবী (সা.) হিশাম বিন আস (রা.) ও আইয়াশ বিন আবি রাবিয়ার (রা.) এই অবস্থা জেনে খুবই উদ্বিগ্ন এবং পেরেশান হন। তিনি ঘোষণা করেন কে আছে এমন যে ঐ দুইজনকে আমার কাছে নিয়ে আসতে প্রস্তুত। অলিদ বিন মুগীরা (রা.) এর দায়িত্ব গ্রহণের কথা রাসূলকে (সা.) জানালেন এবং মক্কায় চলে গেলেন। গোপনে সন্ধান নিয়ে তিনি জানতে পারলেন তাদের দুজনকে একটি ছাদবিহীন ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি রাতের আঁধারে দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে তাদের উদ্ধার করে উটের পিঠে চড়িয়ে মদিনায় নিয়ে

www.bjilibrary.com

আসেন। আরো যাদের হিজরাতে বাধা দিয়ে বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকে রাখা হয় তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমরও একজন। তিনি হাবশা থেকে মক্কায় এসেছিলেন রাসূলের (সা.) সাথে হিজরাতের নতুন স্থান মদিনায় যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার পিতা তাকে জোর করে বন্দী করে রাখে। তিনি বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত পিতার সাথে থেকে যান। পিতার ধর্মে তিনি ফিরে গেছেন এ ধারণা দিয়ে তিনি বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের (পিতাসহ) সঙ্গী হয়ে আসেন এবং সামনাসামনি যুদ্ধের মুহূর্তে তিনি মুসলমান সৈনিকদের সাথে মিলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। রাসূলে পাক (সা.) এর এই সব সাথীগণ যারা ঈমানের দাবী পূরণে সর্বোচ্চ ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, আল্লাহর উপর অটল অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সক্ষম হয়েছেন সর্বোচ্চ ত্যাগ কুরবানীর ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। তারা ছিলেন অদম্য সাহস-হিম্মত, যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং কৌশলী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা এবং দক্ষতার অধিকারী। আর এ জন্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে কবুল করেছিলেন তার দীনের বিজয়ের সংগ্রামে সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্যে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্যদের মদিনায় চলে যেতে নির্দেশ দিলেও তিনি মক্কায় থেকে যান। শেষ সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময় পর্যন্ত অন্যদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত হামজা (রা.) ছাড়া আর যারাই থেকে যান তাদের মধ্যে ছিলেন হাবশা থেকে ফিরে আসা সাতজন যাদেরকে কুরাইশরা বন্দী করে রাখে। তাছাড়া ছিলেন কিছু লোক যারা হিজরাত করতে গিয়ে ধরা পড়েন। অথবা যাদের পক্ষে হিজরাত করা সম্ভব ছিল না। কিছু লোক ঈমানের দুর্বলতার কারণে বা পারিপার্শ্বিকতার কারণেও হিজরাত করতে অপারগ থেকে যায়। বাদবাকী আর প্রায় সবাই মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। হযরত আবু বকর (রা.) হিজরাতের ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে অপেক্ষা করতে বলেন এবং

www.bjilibrary.com

তিনি নিজেও এ জন্যে আদিষ্ট হতে পারেন মর্মে তাকে ধারণা দান করেন, এর মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হিজরাতে রাসূল (সা.) এর সফর সঙ্গী হবার আশ্বাস পেয়ে অত্যন্ত আশান্বিত হন। হযরত আলীকে (রা.) রাসূল (সা.) একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে রেখে দেন। হযরত হামজা (রা.)ও রাসূলের (সা.) পরে মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছেন। সম্ভবতঃ এর পেছনেও কোন বাস্তবসম্মত কারণ ছিল যা জানার সুযোগ আমাদের হয়নি। অনুমান করা যায় রাসূলের (সা.) প্রতি হযরত হামজা (রা.) এর স্নেহ, মায়ামমতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি সকলের জানা। রাসূলের (সা.) নিরাপদে মক্কা ত্যাগের ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হয়তো তিনি মক্কা ছাড়তে চাননি।

হযরত আলীকে (রা.) যে বিশেষ দায়িত্বের জন্যে রাসূল (সা.) বাছাই করেন সেটিও বিশ্বের বিরলতম দৃষ্টান্ত মানবিক দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে। যার ন্যূনতম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় গোটা মানব ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়ে।

মক্কার যে সব লোক তাদের মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণে ভয় পেত বা চুরি ডাকাতি হয়ে যাবার আশংকা করত, তারা তা রাসূলের (সা.) নিকট আমানত হিসেবে জমা রাখত। কট্টরভাবে যারা রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করছিল, তারাও তাঁর উপর এই আস্থা পোষণ করে দ্বিধাহীন চিত্তে আমানত রাখত। রাসূল (সা.) তাদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হলেন, শেষ পর্যন্ত প্রিয় জন্মভূমি, কাবা বায়তুল্লাহর ভূমি, মসজিদুল হারামের ভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু জানের শত্রুদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। সকলের আমানত যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর এক কঠিন ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি চরম ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও রেখে দেন হযরত আলীকে (রা.)। এখানে যেমন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর অতুলনীয় মানবিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি মাত্র ২২/২৩ বছরের যুবক হযরত আলী কত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) জন্যে, কত নির্ভীক চিত্তে হুজুরের সাথে অবস্থান করলেন মানবরূপী হায়েনাদের হিংস্র আক্রমণের মুখে।

www.bjilibrary.com

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে এবার এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তিনি যে কোন মুহূর্তে মদিনা চলে যেতে পারেন। এভাবে রাসূলের (সা.) মদিনায় চলে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থা এবং পরিস্থিতি মক্কার কাফের মুশরিকদের জন্যে যে মোটেই সুখবর নয় বরং সাংঘাতিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, এ চিন্তা-ভাবনায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যেমে বেশ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তাদের কাছে দুটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বসহ বিবেচ্য। এর একটি হল মদিনার দুটি খুবই শক্তিশালী এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গোত্র রাসূলের (সা.) সহায়ক শক্তি হিসেবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তাদেরই সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পেতে যাচ্ছেন একটি নিরাপদ বসবাসের স্থান। অন্য দিকে কুরাইশকূল থেকেও এমন সব ত্যাগী ও সাহসী ব্যক্তিরা তাঁর সাথে শরীক হয়েছে, দীর্ঘ তের বছর নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যারা রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছে, বারবার হিজরাত করে, চরম জুলুম নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে যারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে, জানমাল আত্মীয়-পরিজন সবকিছুই ত্যাগ করতে পারে, এমনকি তারা ত্যাগ করতে পারে প্রিয় জন্মভূমিও। অসাধারণ যোগ্যতা দক্ষতা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী নবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তাদের ইতিপূর্বেই যে ধারণা হয়েছে, তাতে এ বিষয়টি তাদেরকে আরো উদ্বিগ্ন করে তুলে যে, এমন ব্যক্তির নেতৃত্বে এরূপ নিবেদিত প্রাণ লোকদের নিয়ে মদিনার মত একটি কৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি নগর রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, তাদের মত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর জন্যে মহা বিপর্যয়ের কারণ হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ লোহিত সাগরের তটভূমির উপর দিয়ে চলে গেছে, তার নিরাপত্তার উপরই কুরাইশসহ অন্যান্য বড় বড় মুশরিক গোত্রগুলির অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। এখন এটা সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। এর উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ নিয়ে তারা জাহেলী জীবন ব্যবস্থার উপর আঘাত হানার সুযোগ নিশ্চয়ই হাত ছাড়া করবে না।

আকাবার সর্বশেষ বায়াতের খবরে তাই তারা সাংঘাতিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং রাসূলকে (সা.) এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিয়ে হয় ব্যর্থ। এবার শেষ সিদ্ধান্তের জন্যে তারা সমবেত হয়

www.bjilibrary.com

দারুন্নাদাওয়ায়। সকল কওমের প্রধানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই গোপন বৈঠকে বসে তারা তাদের আশংকার পথ রুদ্ধ করার পন্থা বের করার জন্যে শলাপরামর্শ করে। কারো কারো প্রস্তাব ছিল যে, এ ব্যক্তিকে লোহার শিকল পরিয়ে কোথাও বন্দী করে রাখা হোক। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর তাকে মুক্ত করা হবে না। কিন্তু এ অভিমত বৈঠকে সমর্থিত হয়নি। কারণ অনেকের মতে তার বন্দী অবস্থায় অন্যরা কাজ চালিয়ে যাবে। এমন সময় সুযোগ মত শক্তি সঞ্চয় করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে মুক্ত করে ছাড়বে। কেউ প্রস্তাব করল, তাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হোক। সে যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে আর কোথায় কি করল সে নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথারও কোন কারণ থাকবে না। আর আমাদের এখানে থাকলে তো সে বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করত যা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এ প্রস্তাবটিও এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হল যে, সে যদি এখান থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে না জানি কোন কোন গোত্রকে আপন করে নিয়ে শক্তি অর্জন করে আরবের কেন্দ্রস্থলকে তার অধীনে নেয়ার জন্যে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। সব শেষে আবু জেহেল প্রস্তাব করল, আমাদের সকল গোত্র থেকে একজন করে সম্ভ্রান্ত চালাক চতুর লোক বাছাই করতে হবে এবং সকলে মিলে এক সাথে তাকে হত্যা করতে হবে। এভাবে মুহাম্মদের খুনের দায়-দায়িত্ব সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। তখন আর বনি আবদ মানাফ বা বনি হাশেম গোত্রের একার পক্ষে সকল গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে না। এ জন্যে তারা রক্তপণ গ্রহণে রাজী হতে বাধ্য হবে।

আবু জাহেলের এই প্রস্তাবে অবশেষে সকলে সম্মত হল। এমনকি হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার জন্যে লোকও মনোনয়ন করা হয়ে গেল। হত্যার সময়ও নির্ধারিত হল। দারুন্নাদওয়ার এই গোপন বৈঠকের যাবতীয় কার্যবিবরণী এমন গোপন রাখা হল যে, কানে কানেও যেন এ খবর কোথাও পৌঁছতে না পারে। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টিই সূরায়ে আনফালের ৩০ নম্বর আয়াতে এভাবে ইংগিত করা হয়েছে;

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ-

www.bjilibrary.com

"(এবং হে নবী, সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন কাফেরগণ তোমাকে নিয়ে নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা মেরে ফেলবে, অথবা বহিষ্কার করবে। তারা তাদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল, আর আল্লাহও তার নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করেন, আল্লাহর কৌশল ও পরিকল্পনাই সর্বোত্তম।"

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে মক্কার সব গোত্র প্রধানদের উপস্থিতিতে দারুন্নাদওয়ায় সর্বসম্মতভাবে রাসূলকে (সা.) হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর কাফের মুশরিকগণ আয়োজন করতে থাকে তা বাস্তবায়নের। ঠিক এমনি মুহূর্তেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার প্রিয় নবী মুহাম্মদকে (সা.) অনুমতি দেওয়া হল মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের। আর সেই সাথে শিখিয়ে দিলেন নিম্নোক্ত দোআটি যা অত্যন্ত অর্থবহ এবং প্রণিধানযোগ্য;

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا -

"হে নবী দো'আ কর এই বলে, "হে আমার রব আমাকে প্রবেশ করাও সত্যসহ প্রবেশ করার স্থানে এবং সত্যসহই আমাকে বের কর বের হবার স্থান থেকে। আর তোমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত রাষ্ট্রশক্তিকে আমার সহায়ক বানিয়ে দাও।" (বনি ইসরাইল : আয়াত-৮০)

এই অনুমতি প্রাপ্তির পরবর্তী রাতকে কাফেররা নির্ধারিত করেছিল হুজুরকে (সা.) হত্যা করার জন্যে। ঐ দিনই জিব্রাইল আমীন (আ.) আল্লাহর রাসূলকে (সা.) এ ব্যাপারে অবহিত করেন এবং ঐ দিনগত রাতে তাকে তার নিজের বিছানায় শুতে মানা করেন।

হুজুর (সা.) সাধারণত হযরত আবু বকর (রা.) এর বাস ভবনে দিনের প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে যাওয়া আসা করতেন। কিন্তু ঐ দিন গেলেন দুপুর বেলায়। কারণ এ ছাড়া আর সময় ছিলনা। হযরত আবু বকর (রা.) বুঝে নেন যে, নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার আছে বলেই হুজুর (সা.) এ

www.bjilibrary.com

সময়ে এসেছেন। হুজুর (সা.) বাড়ীর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে এসেই হযরত আবু বকর (রা.) এর সাথে একান্তে কথা বলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, এতো আপনার বাড়ীরই সব লোক। হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা মতে সে সময়ে তিনি (হযরত আয়েশা) ও তার বোন আসমা (রা.) ছাড়া আর কেউই হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে ছিল না। খবর বাইরে পাচার হবার কোন আশংকা নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে হুজুর (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) কে জানালেন যে, "আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এ কথা শোনা মাত্র হযরত আবু বকর (রা.) আবেগের সাথে বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক! আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারব? হুজুর (সা.) বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই। হযরত আবু বকর (রা.) হিজরাতের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ দুটি উট যোগাড় করে রেখেছিলেন। তিনি এর কোন একটি হুজুর (সা.) কে তার পছন্দ মত নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। হুজুর (সা.) উক্ত উটের ক্রয় মূল্য দিয়ে দেওয়ার শর্তে রাজী হলেন। বনি আদ্দীলের আব্দুল্লাহ বিন উরাইকেতকে পারিশ্রমিকসহ পথ দেখাবার জন্যে নিযুক্ত করলেন। সে ছিল পথ-ঘাট সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাছাড়া ঈমান না আনলেও হুজুর এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর খুবই আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। দুটো উটই তার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হল এই শর্তে যে যখন যেখানে ডাকা হবে তখন সে স্থানে সাথে সাথেই সে পৌঁছে যাবে।

ইতিহাসের এক কঠিনতম রজনী

নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের জীবনে মক্কার তেরটি বছরের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তই ছিল বাধা প্রতিবন্ধকতায় ঘেরা, যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে ধাপে ধাপে। নি:সন্দেহে তার মধ্যে কঠিনতম রাত ছিল এটি। আবার অন্যদিকে বিচার করলে বলতে হয় চরম বিপদ সংকুল এই রাতটিই ছিল আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের শুভ সূচনা। এই রাতে হিজরাতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথ ও পন্থা নিয়ে তার একান্ত বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর

www.bjilibrary.com

(রা.) এর সাথে দিনের দ্বিপ্রহরে আলাপ আলোচনা সেরে নিজ বাসগৃহে চলে আসেন আল্লাহর রাসূল (সা.) অতি সংগোপনে; যাতে কাফেরদের পরিকল্পনার কথা তিনি ইতিমধ্যেই যে জেনে গেছেন এটা যেন ওরা ঘূর্ণাক্ষরেও টের না পায়।

ঐ রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঐসব লোকেরা পৌঁছে যায় রাসূল (সা.) এর বাসগৃহের সন্নিকটে, যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে। এদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। যার নেতৃত্বে ছিল আবু জাহেল। তাদের নামগুলো নিম্নরূপ; (১) আবু জাহেল (২) হাকাম বিন আবিল আস (৩) ওকবা বিন আবি মুয়াইত (৪) নদর বিন আল হারেস (৫) উমাইয়া বিন খালফ (৬) হারেস বিন কায়েম বিন গায়তালা (৭) জামায়া বিন আল আসওয়াদ (৮) তুয়ায়মা বিন আদি (৯) আবু লাহাব (১০) উবাই বিন খালফ (১১) নুবায়া বিন আল হাজ্জাজ (১২) মুনাবেব বিন হাজ্জাজ।

এরা এসে রাসূল (সা.) এর বাড়ী ঘেরাও বা অবরোধ করার আগেই আল্লাহর রাসূল (সা.) তার বিছানায় হযরত আলীকে (রা.) শোবার ব্যবস্থা করেন। তার গায়ের উপর উড়িয়ে দেন রাসূল (সা.) এর ব্যবহারের নিজস্ব চাদর, যা সবুজ রং বিশিষ্ট এবং হাদরা মাউতী চাদর হিসেবে খ্যাত ছিল। ফলে বাইরে থেকে দুশমনেরা উঁকিঝুকি মেরে এ অবস্থা দেখে মনে করে, নবী মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং শুয়ে আছেন সেই বিছানায়। তাদের কেউ কেউ দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতে চাইলেও ঢুকেনি তাদের সম্ভ্রম প্রীতির কারণে। তারা ঐতিহ্যগতভাবে সচেতন ছিল যদি তারা রাতের আঁধারে তাদেরই নিকট আত্মীয়দের বাসগৃহে হানা দেয় তাহলে সারা দেশে তাদের বদনাম হবে। এমন কি এতে এ বদনামও হতে পারে যে আমরা তাদের মেয়েদের মানসম্ভ্রমের প্রতিও খেয়াল করিনি। এ কারণে সারা রাত তারা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বাসভবন ঘিরে রাখে। প্রতিক্ষা করতে থাকে ভোরের জন্যে। যাতে করে রাসূল (সা.) ঘুম থেকে জেগে উঠলেই তারা একযোগে হামলা চালিয়ে তাদের সেই জঘন্য সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে।

www.bjilibrary.com

এমতাবস্থায় দুশমনদের ঘেরাওয়ের মধ্য দিয়ে রাতের কোন এক মুহূর্তে হুজুর বাইরে আসেন এবং তাদের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে করতে তাদের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে যান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ হেফাজতে। এই সময়ে তিনি সূরায়ে ইয়াসিনের প্রথম দিকের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছিলেন। ভোরে হুজুর (সা.) এর বিছানা থেকে হযরত আলীকে ওঠতে দেখে তারা বুঝতে পারে, রাসূল (সা.) অনেক আগেই চলে গেছেন এ বাসগৃহ ত্যাগ করে। এর পর তারা হযরত আলীকে (রা.) জিজ্ঞেস করতে থাকে রাসূল (সা.) এর অবস্থান জানার জন্যে। হযরত আলী (রা.) তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বলেন, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি আরো বলেন, 'আমি তো তার পাহারাদার নই। তোমরা তাকে বের করে দিয়েছ। তিনি বের হয়ে গিয়েছেন। হযরত আলীর জবাবে রক্ত পিপাসু হায়েনার দল ক্ষেপে গিয়ে তাকে গালাগালি করতে করতে মারপিট শুরু করে দেয়। তাকে ধরে নিয়ে যায় মসজিদুল হারামে। সেখানে তাকে কিছুক্ষণ বন্দী করেও রাখে। হুজুরের কোন সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে মনে করা হয়; যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই জেনে যায় যে, রাসূল (সা.) তাকে বিভিন্ন লোকের আমানত ফেরৎ দেবার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সুতরাং তাদের সম্পদ ফেরৎ পাওয়ার লোভও এখানে একটা কারণ হতে পারে। তাছাড়া এটা জেনেও তাদের মধ্যে লজ্জাবোধ ও নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধবোধ সৃষ্টি হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়, যে ব্যক্তিকে আমরা হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলাম সে লোকটি কত মহৎ কত উত্তম চরিত্রের অধিকারী। হত্যার সম্ভাব্য স্থান থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও দুশমনদের আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। এ দিকে নিজ বাসগৃহ থেকে বেরিয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.) দ্রুত সময়ের মধ্যে চলে আসেন হযরত আবু বকর (রা.) এর বাসগৃহে। অত:পর পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক রাতেই তারা দুজনে মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিজিতে আছে; মক্কা থেকে বের হবার মুহূর্তে হুজুর (সা.) 'হাযওয়ারে' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দরদ ভরা

www.bjilibrary.com

কণ্ঠে বলেন, "হে মক্কা! খোদার কসম! আল্লাহর জমিনে তুমি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তোমার লোকেরা যদি আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এরপর তিনি সওর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

হযরত আলীকে (রা.) বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেবার পর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা হযরত আবু বকর (রা.) এর বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ চালায়। ইবনে ইসহাক হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) এর বরাত দিয়ে এ ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে "হযরত আসমা বলেন, এ ঘটনার দ্বিতীয় দিনে কুরাইশদের কতিপয় লোক আমাদের বাড়ীতে আসে, তাদের সাথে আবু জাহেলও ছিল। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, জানিনা। এতে আবু জাহেল আমাকে এমন জোরে থাপ্পর মারে আমার কানের গহনা ভেঙ্গে দূরে ছিটকে পড়ে। এরপর তারা চলে যায়।

হিজরাতে রাসূল (সা.) ও আবু বকর (রা.) পরিবারের ভূমিকা

আগাম বার্তা পেয়ে হিজরাতের জন্যে হযরত আবু বকর (রা.) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তার দুটো উট প্রস্তুত রাখার কথা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি তার মহান সাথী, সফর সঙ্গী মহানবী (সা.) ও তার নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে নিলেন একটি থলিতে করে। তিনি তার সমুদয় অর্থ (প্রায় পাঁচ হাজার দিরহাম) সাথে নিয়ে নেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহকে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তার এ দায়িত্ব ছিল দিনের বেলা মক্কাবাসীর সাথে মিশে থেকে যাবতীয় খোঁজ খবর নিয়ে রাতে সওর গুহায় গিয়ে অবহিত করা। আব্দুল্লাহ দিনের কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করে রাত কাটাতেন গুহাতেই হুজুর (সা.) ও তার পিতার সাথে। আবু বকর (রা.) তার আযাদকৃত গোলামকে দিনের বেলা ছাগল চড়ানো ও মক্কাবাসী থেকে খবর সংগ্রহ করে রাতে তা জানাবার এবং ছাগলের দুধ পৌছাবার নির্দেশ দেন। ইবনে ইসহাক (রা.) এর মতে হযরত আসমা (রা.) প্রতিরাতে টাটকা খাবার তৈরী করে পাঠাতেন।

সওর পর্বতের পথে হযরত আবু বকর শুধু একজন সফর সঙ্গীই নয় বরং সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কখনও হুজুর (সা.) এর সামনে যেতেন। আবার কখনও পেছনে থাকতেন। যাতে পশ্চাদ অনুসারীদের দিক থেকে কোন বিপদ আপদ না আসতে পারে। গুহার নিকটবর্তী হয়ে তিনি রাসূলকে (সা.) একটু থামতে বলে নিজে ভেতরটা দেখে নিলেন ও পরিষ্কার করলেন। ঐ রাতের অন্ধকারেই তিনি খোঁজ নিয়ে নিয়ে গুহার ভেতরের গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিলেন। অবশেষে একটি গর্ত থেকে গেলে সেটা তিনি বন্ধ করে হুজুরকে (সা.) নিয়ে যান গুহার ভেতরে। কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথারও উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বকর অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে গর্তগুলোর সন্ধান করেন এবং নিজের চাদর, ছিঁড়ে টুকরো করে করে তা বন্ধ করেন। একটি গর্ত এর পর থেকে গেলে সেটি হযরত আবু বকর বন্ধ করে রাখেন তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে যাতে কোন বিষধর প্রাণী হুজুরকে দংশন করতে না পারে।

সওর গুহায় একটি দুশ্চিন্তার মুহূর্তে

কুরাইশ নেতারা হুজুর (সা.) কে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে দিক বিদিক খুঁজতে থাকে হন্যে হয়ে। মক্কা থেকে মদিনায় যাবার সম্ভাব্য পথগুলো দেখে ব্যর্থ হয়ে তারা যাত্রা করে সওর পর্বতের দিকে। পৌঁছে যায় হুজুর (সা.) এর অবস্থানের একেবারে কাছাকাছি। তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পান হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি দেখতে পান তারা একবারে গুহার প্রান্তে উপনীত। নিচের দিকে তাকালেই দেখে ফেলবে তারা; তাই হযরত আবু বকর (রা.) এর দুশ্চিন্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দুশমনদের একজন গুহার ভেতরটা দেখা যাক বললে, তাদেরই একজন বলল, এখানে আর কি পাবে? এখানে যে মাকড়সার জাল দেখছি, তাতো মুহাম্মদের (সা.) জন্মেরও আগের তৈরী বলে মনে হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এরপর তারা পেছন দিকে ফিরে যায়। দুশমনদেরকে এভাবে গুহার দ্বারপ্রান্তে দেখে দুশ্চিন্তায় হযরত আবু বকর (রা.) এর কান্না পায়। তিনি রাসূলকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এদের কেউ তাদের পায়ের নীচে তাকালেই তো আমাদের দেখে ফেলবে। হুজুর (সা.) নিশ্চিন্তভাবে জবাবে

www.bjilibrary.com

বললেন, হে আবু বকর, ঐ দু'টি লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে আছেন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ। অন্য বর্ণনা মতে এ সময়ে হুজুর ছিলেন নামাজরত। যখন দুশমনরা গুহার দ্বারপ্রান্তে এসে যায়, আবু বকর (রা.) তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে দুশ্চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েন। হুজুর (রা.) এর নামাজ শেষ হতেই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক, আপনার কওম আপনার তালাশে এসে পৌঁছেছে। খোদার কসম আমি আমার জন্যে কাঁদছিনা, কাঁদছি এ ভয়ে যাতে আমার চোখের সামনে আপনার ওপর কোন আঘাত না পৌঁছে। হুজুর (সা.) তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "দুশ্চিন্তা করনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" ঠিক এ কথারই উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক সূরায়ে তাওবার ৪০ নম্বর আয়াতে

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا –

"যদি তোমরা (মুসলমান) তার (নবী মুহাম্মদের) সাহায্য না কর, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ তাকে সেই মুহূর্তে সাহায্য করেছিলেন যখন তিনি ছিলেন দুজনের একজন। যখন তারা দুজন ছিলেন গুহার মধ্যে তখন তিনি তার সাথীকে বলেছিলেন দুশ্চিন্তা কর না আমাদের সাথে আছেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরা আত তাওবা : ৪০)

সওর গুহায় আশ্রয় ও অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্ব

মক্কা থেকে মদিনায় যাবার সকল পথই উত্তরমুখী, আর সওর হল মক্কা থেকে বেশ কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হুজুর (সা.) এদিকে গেলেন কেন? কারণ একটাই, আর তাহল দুশমনদেরকে তার অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলা। এ কারণেই তাদের তাৎক্ষণিক কোন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। গুহায় কয়েক দিন অবস্থান করাও তাৎপর্যহীন নয়। কয়েক দিন খোঁজাখুঁজির পর দুশমনদের তৎপরতায় শৈথিল্য আসতে বাধ্য। সেই সুযোগে প্রস্থান করা হতে পারে অধিকতর নিরাপদ। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান নেতা এখানে যেমন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার চরম

www.bjilibrary.com

পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন, তেমনি প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলী ভূমিকার ক্ষেত্রে এটা ছিল একটি শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত।

সওর পর্বত গুহা থেকে মদিনার পথে যাত্রা হল শুরু

হুজুর পাক (সা.) তার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর (রা.) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সর্বমোট তিন রাত তিন দিন অবস্থান করেন। কাফেরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয়ের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। তাদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে হুজুর (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, তিন দিনের খোঁজাখুঁজির পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের তৎপরতা শিথিল হয়ে আসছে। অতএব তৃতীয় রাতের শেষ প্রহরে মদিনার পথে যাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত নিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আব্দুল্লাহ বিন উরাইকেত উট দুটো এনে হাজির করল। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর নিয়ে এলেন কয়েক দিনের চলার মত খাবার, যা বেঁধে দিলেন তার কোমরবন্দের কাপড় ছিঁড়ে যাকে আরবীতে বলা হয় নেতাক। আব্দুল্লাহ বিন উরাইকেত মুসলমান না হলেও রাসূল (সা.) এবং আবু বকর (রা.) দুজনেরই ছিলেন বিশ্বস্ত। দুজনকে ধরিয়ে দিয়ে মোটা অংকের পুরষ্কার পাওয়ার লোভ তাকে বিশ্বাস ভঙ্গে প্রলোভিত করতে পারেনি। দুটো উটের একটিতে হুজুর উঠলেন, অন্যটিতে হযরত আবু বকর (রা.) উঠলেন, সাথে নিলেন খেদমতের জন্যে আমের বিন ফুহায়রাকে। আব্দুল্লাহ বিন উরাইকেত পায়ে হেটে দায়িত্ব পালন করে পথ দেখাবার। রাসূল (সা.) এর এই ঐতিহাসিক সফর শুরুর দিন তারিখ নিয়ে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ সফর শুরু হয় রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকেই।

যেহেতু রাসূলের (সা.) নিরাপত্তার স্বার্থে কাফির-মুশরিকদের দৃষ্টি এড়ানো ছিল অত্যন্ত জরুরী, তাই আব্দুল্লাহ বিন উরাইকেত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সাধারণ পথ পরিহার করে চলতে থাকে মদিনার দিকে। হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে যাওয়া আসা করতেন বিধায় অনেকেই তাকে চিনে যখন জিজ্ঞেস করত আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি জবাবে বলতেন এ লোকটি আমাকে পথ দেখায়।

www.bjilibrary.com

এভাবে পথ চলতে চলতে দ্বিতীয় দিন দ্বি-প্রহরে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলেন হযরত আবু বকর (রা.)। একটি বড় পাথরের নীচে তখনও ছায়া আছে দেখে সেখানেই এর ব্যবস্থা করলেন। সেখানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে রাসূলকে (সা.) বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। নিজে নজর রাখলেন চারদিকে, কোন দুশমন এ দিকে আসছে কিনা এটা দেখার জন্যে। এ সময়ে একজন বালক ছাগল চড়াতে চড়াতে এই শিলাখন্ডের কাছে আসে বিশ্রামের জন্যে। হযরত আবু বকর (রা.) তার সাথে আলাপ করে নিজেই ছাগলের দুধ দোহন করে হুজুরকে (সা.) পান করানোর ব্যবস্থা করেন।

চলার পথে আল্লাহর কুদরতী সাহায্য

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার সফরসঙ্গী হযরত আবু বকরকে (রা.) হত্যা ও গ্রেফতারের জন্যে একশত উট পুরস্কারের ঘোষণার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। অতএব হুজুরের যাত্রা পথের সন্ধানে তীক্ষ্ণ নজর ছিল অনেকেরই। এই পুরস্কারের নেশায় পেয়ে বসেছিল সুরাকা নামক ব্যক্তিকে। সে তার কওমের লোকদের সাথে বসা অবস্থায় একজনের কাছে খবর পায় যে, সমুদ্রের তীর ঘেঁষে কিছু লোক যেতে দেখা গেল সম্ভবত: তারা হবে মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাথী। সুরাকা মনে মনে নিশ্চিত হয়ে যায় ইনিই হবেন মুহাম্মদ (সা.)। কিন্তু অন্যরা টের না পায় সেজন্যে চালাকি করে বলল তুমি হয়তো অন্য কাউকে দেখেছ। এরপর কাউকে টের পেতে না দিয়ে সে ঘোড়া দৌড়িয়ে পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল হুজুর (সা.) ও তার সফর সঙ্গীর। হযরত আবু বকর (রা.) তার পিছে পিছে আসা টের পেয়ে যান এবং আশংকা বোধ নিয়ে হুজুরকে (সা.) বলেন, আমাদের এ পশ্চাদঅনুসারীতো একেবারে কাছেই এসে যাচ্ছে। হুজুর (সা.) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। সুরাকার ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে যায়। সুরাকা আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যাত্রা তার শুভ না অশুভ জানার চেষ্টা করে তার তীর নিক্ষেপ করে এবং নিশ্চিত হয় এ যাত্রা তার জন্যে শুভ নয়। তবুও অগ্রসর হতে থাকে পুরস্কারের লোভে। এবার তার ঘোড়ার পা মাটিতে প্রোথিত হতে লাগল। এবারও ভাগ্য পরীক্ষার ফল দেখল তার জন্যে নেতিবাচক। কিন্তু তারপরও পুরস্কারের লোভ সামলাতে পারছিলনা সুরাকা।

www.bjilibrary.com

অবশেষে নিরুপায় হয়ে হুজুরের শরনাপন্ন হল এবং তার উদ্দেশ্য অকপটে বিস্তারিত বর্ণনা করল। এরপর সে তার সাথে আনা রসদ সামগ্রি হুজুরকে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। হুজুর তাকে শুধু একটি বিষয়ই বললেন যে, তার সন্ধান যেন সে কাউকে না দেয়। সুরাকা এরপর হুজুরের কাছে একটি অভয়নামা লিখে চাইল। হযরত আবু বকর (রা.) এর গোলাম আমের বিন ফুহায়রা তাকে রাসূলের (সা.) হুকুমে এক টুকরো চামড়ায় এ অভয়নামা লিখে দেন। এরপর সুরাকা হুজুরের খেদমতে আবেদন পেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি আমাকে যে কোন আদেশ করতে পারেন। হুজুর বললেন, বাস নিজের জায়গায় থাক এবং আমাদের পর্যন্ত কাউকে পৌঁছতে দিওনা। এভাবেই আল্লাহর কুদরতের ফায়সালায় যে ব্যক্তি জীবন নিতে এসেছিল সে হয়ে গেল জীবনের রক্ষক। যার পর থেকে যারাই এ পথে রাসূল (সা.) এর সন্ধানে আসতো সুরাকা তাদের ফিরিয়ে দিত এই বলে যে, 'আমি নিশ্চিত যে এদিকে তিনি নেই। আর তোমরা নিশ্চয়ই জান আমার দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ এবং গোয়েন্দাগিরিতে আমি কতটা দক্ষ।" এভাবেই নিরাপদ হয়ে যায় রাসূলের (সা.) মদিনার যাত্রা পথ আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে।

চলার পথে আর একটি কুদরতী সাহায্যের ঘটনা ঘটে উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে। খুযায়ের গোত্রের একটি শাখা বনি কাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উম্মে মা'বাদ ঐ গোত্রের সম্ভ্রমশীলা বয়োবৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। এ পথে যারা যাতায়াত করত তাদের মেহমানদারী করতো এ পরিবার। রাসূল (সা.) যখন ঐ তাঁবুর কাছে পৌঁছলেন তখন এই মহিলা তাঁবুর সামনে উঠানে বসা ছিলেন। এ সময়টা ঐ এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। হুজুরের কাফেলার পক্ষ থেকে মূল্য দিয়ে কিছু খাবার সামগ্রী চাওয়া হল। মহিলা বললেন খোদার কসম আমাদের কাছে কোন খাদ্য সামগ্রি থাকলে আমরা মেহমানদারীতে কুণ্ঠাবোধ করতাম না। এ সময় তাঁবু কোণে একটি ছাগীর প্রতি হুজুরের নজর পড়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন উম্মে মা'বাদ এ বকরীটা কেমন? তিনি বললেন, এটা এতই দুর্বল যে অন্য ছাগলের সাথে যেতে পারেনি। হুজুর বললেন এটি কি দুধ দিতে পারে? তিনি বললেন এর পক্ষে তো দুধ দেওয়া মোটেই সম্ভব নয় কারণ সে অত্যন্ত দুর্বল। হুজুর বললেন, আপনি

www.bjilibrary.com

অনুমতি দিলে আমি তার দুধ দুইতে পারি। তিনি বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কোরবান, আপনি যদি তার দুধ বের করতে পারেন তো অবশ্যই করুন।

এরপর হুজুর বকরীটি নিকটে আনিয়ে তার স্তনে ও পিটে হাত বুলালেন এবং দো'আ করলেন "হে আল্লাহ এই স্ত্রী লোকটির ছাগলগুলোতে বরকত দান কর। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে দুধ দুইতে শুরু করলেন। আল্লাহর কি শান বকরীটি তাৎক্ষণিকভাবে পা ছড়িয়ে জাবর কাটতে থাকে। তার স্তন থেকে দুধের স্রোত ধারা বইতে থাকে। হুজুর একটা বড় পাত্র চাইলেন যা দলের সকলের তৃপ্তিসহ পান করার মত দুধ ধারণ করতে পারে। তিনি দুধ দুইয়ে চললেন এবং পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। দুধের উপর ফেনা পড়ল। তিনি প্রথমে এ দুধ উম্মে মা'বাদকে পান করালেন, তারপর সাথীগণকে পান করালেন এবং সবার শেষে তিনি পান করলেন এবং বললেন, "সাকিউল কাওমি আখিরুহুম" যে অন্যলোককে পান করায় সে স্বয়ং পান করে সবার শেষে।" অত:পর পুনরায় ঐ পাত্র পুরণ করলেন দুধ দুইয়ে এবং বললেন, মা'বাদের বাপ এলে তাকে দেবেন এ দুধ পান করতে।

পরবর্তী পর্যায়ে এরা স্বামী স্ত্রী দু'জনই ইসলাম কবুল করেন এবং হিজরত করে মদিনায় রাসূলের (সা.) খেদমতে হাজির হন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন।

মদিনাবাসীর প্রতীক্ষার মুহূর্ত

রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে বের হবার খবর পৌঁছে যায় বেশ আগেই। সম্ভবত সওর পর্বতের গুহায় তিনদিন অবস্থানের কারণে মদিনাবাসীর ধারণার চেয়ে, কয়েকদিন বিলম্বে পৌঁছেন আল্লাহর রাসূল (সা.)। একারণে তাদের প্রতীক্ষার মুহূর্ত হয় প্রলম্বিত। আর এ কারণে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় কিছুটা অস্থিরতা। প্রতিদিন তারা সকাল বেলা বেরিয়ে এসে মক্কার পথে বসে অপেক্ষা করতেন। রোদের উত্তাপ অসহনীয় পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত তারা বসে থাকার পর বাড়ী ফিরতেন। এভাবে প্রতিদিন আনসার ও মোহাজেরগণ 'হারবাতুল আসরা' নামক স্থানে গিয়ে বসতেন এবং সূর্যের তাপ প্রখর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

www.bjilibrary.com

মদিনাবাসীর এই আগ্রহ ও উৎসাহ প্রমাণ করে তিনি নিছক আশ্রিত হিসাবে মদিনায় যাচ্ছিলেন না। তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন তাদের কাংখিত ও নন্দিত নেতা হিসাবে।

প্রতীক্ষার অবসান হলো

প্রতিদিনের মত প্রতীক্ষা শেষে আজও আনসার ও মোহাজেরগণ যখন নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিলেন-এমনি সময় হুজুর তার কাফেলাসহ কুবায় পৌঁছেন। কুবার নিকটবর্তী হবার মুহূর্তেই একজন ইয়াহুদী তার দুর্গের উপর থেকে রাসূলের (সা.) কাফেলাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং উচ্চস্বরে বলল, হে বনি কায়লা (আনসার গোত্রের লোকেরা), এই যে তোমাদের নেতা এসে গেছেন। একথা শোনামাত্র কুবায় বসবাসকারী বনি আমর বিন আউফের লোকেরা সমস্বরে তাকবির ধ্বনি বুলন্দ করে হুজুরের সাদর সম্বর্ধনার জন্যে এগিয়ে আসে। এই সময় হুজুর (সা.) এবং আবু বকর (রা.) একটি খেজুর গাছের ছায়ায় এসে অবস্থান করছিলেন। আনসারদের বিরাট দল প্রচন্ড আবেগ উদ্দীপনাসহ হাজির হয় হুজুরের সন্নিকটে। অদম্য ভাবাবেগে লোকেরা গায়ের উপর ঢলে পড়ছিল কিন্তু তখনও তারা বুঝতে পারেনি কে আল্লাহর রাসূল (সা.)। কেউ কেউ আবু বকরকেই (রা.) ভাবতে থাকে। কিন্তু খোদ আবু বকর (রা.) যখন তার চাদর দিয়ে রাসূলের ছায়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন তখন তাদের আর চিনতে বাকী থাকল না। তখন সবাই তাকে সালাম জানাতে এগিয়ে আসতে থাকে। এখানে হুজুরের আগমনি বার্তার ঘোষণা দিতে গিয়ে ইয়াহুদী ব্যক্তির উক্তিটি লক্ষণীয়। "তোমাদের নেতা এসেছেন" কথাটি প্রমাণ করে মদিনার মুমিন, মুশরিক ও ইয়াহুদী সবার কাছেই এটা পরিস্কার ছিল যে মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় নিছক একজন আশ্রিত ব্যক্তি হিসাবে নয়, বরং মদিনার আনসারদের নেতা এবং শক্তিশালী শাসক হিসাবেই আগমন করেছেন।

কুবায় হুজুরের অবস্থান

কুবায় হুজুর (সা.) দশদিন বা দশদিনের কিছু বেশী সময়কালের জন্যে অবস্থান করেন। তিনি এখানে অবস্থান করেন আউস গোত্রের বনি আমর বিন আউফের বস্তিতে। মেহমানদারীর সৌভাগ্যলাভ করেন কুলসুম বিন

www.bjilibrary.com

হিদাম। আর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতো সা'দ বিন খায়সামার বাড়ীতে। এখানে অবস্থানকালে হুজুর (সা.) মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন। ইসলামী যুগের এটাই পয়লা মসজিদ যেখানে আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে প্রকাশ্যে নামাজ কায়েম করেন। এসময় হযরত আলী (রা.) এসে হুজুরের (সা.) সাথে মিলিত হন।

কুবা থেকে এবার মদিনার পথে

কুবায় অবস্থান শেষে এবার হুজুর (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কিছুটা বেলা হবার পরে রওয়ানার কারণে পথিমধ্যে বনি সালেম বিন আউফের বস্তিতে পৌঁছতেই জুমআর নামাজের সময় হয়ে যায়। তিনি সাথে সাথে সেখানে নেমে পড়েন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে জুমআ আদায় করেন। রাসূলের (সা.) ইমামতীতে এটাই ছিল প্রথম জুমআর নামাজ এবং এখানেই প্রথম জুমআর খুৎবা প্রদান করেন। অত:পর মদিনার পথে যাত্রাকালে হযরত বিন মালেক ও আব্বাস বিন ওবাদার নেতৃত্বে জনতা হুজুরকে (সা.) এই বস্তিতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। হুজুর বললেন উটের রশি ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর ইশারায় চলছে। সে যেখানে থামবে আমি সেখানেই অবতরণ করব। একই ভাবে পথে পথে আরো অনেকেই এ আবদার জানাতে থাকে। হুজুর (সা.) সবাইকে একই জবাব দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি উটকে স্বাধীনভাবে চলতে দেন সামান্যতম ইশারা ইংগীতও দেননি। অত:পর রাসূলের উট বনি মালেক বিন নাজ্জারের মহল্লায় গিয়ে ঠিক সেই স্থানে বসে পড়ে যেখানে আজ মসজিদে নববী অবস্থিত মতান্তরে রাসূলের (সা.) মিম্বার অবস্থিত। হুজুর সাথে সাথে অবতরণ না করে কিছুক্ষণ উটের পিঠে বসে থাকেন। উট আবার উঠে কিছু দূর চলার পর পূর্বের স্থানেই ফিরে আসে এবং বিশ্রামের জন্যে গা এলিয়ে দেয়। এ সময় হুজুর উটের পিঠ থেকে নেমে পড়েন। সামনেই ছিল আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ী। তিনি হাজির হন এবং হুজুরের সামানপত্র নামিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে যান। হুজুর তার ওখানেই অবস্থান করেন। কারো মতে হুজুর জানতে চান কার বাড়ীর নিকটে, উত্তরে আবু আইয়ুব আনসারী বলেন আমার বাড়ীই নিকটে। এই আমার বাড়ী এই আমার দরজা। কারো মতে এনিয়ে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন আমি

www.bjilibrary.com

বনি নাজ্জারের ওখানে থাকব, ওটা আবদুল মুত্তালিবের নানার পরিবার। এটা বলার কারণ ছিল ঐতিহ্যগতভাবে আরবরা আত্মীয়তার হককে অগ্রাধিকার দিত। আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ীটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। আবু আইয়ুব আনসারীর আবদার ছিল হুজুর (সা.) যেন উপর তলায় থাকেন। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার্থে হুজুর (সা.) নীচতলায় থাকাই পছন্দ করেন। একান্ত অনীহা সত্ত্বেও আবু আইয়ুব উপর তলায় থাকতে বাধ্য হন। মদিনায় রাসূলের (সা.) উপস্থিতি জনমনে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তা ছিল একান্তই অতুলনীয়। নজির বিহীন এই সংবর্ধনার দৃশ্য না ইতিপূর্বে আরবের কোথাও কেউ দেখেছে না এর পরবর্তী কোন কালে। বোখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থের বর্ণনা মতে আবু বকর (রা.) তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা মদিনায় পৌঁছতেই দেখলাম, জনতা আমাদের সংবর্ধনার জন্যে রাজপথে বেড়িয়ে এসেছে। ছাদের উপর জমেছে মানুষের প্রচন্ড ভিড়। যুবকেরা রাস্তায় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ছুটাছুটি করছে আর শ্লোগান দিচ্ছেন আল্লাহু আকবার বলে। উল্লাসে ফেটে পড়ে বলছিল এসেছেন মুহাম্মদ (সা.)। মানুষের ভিড়ের মধ্যে রাসূলকে (সা.) দেখার জন্যে অনেকেই উঁচু জায়গায় অবস্থান নেয়। মেয়েরা ছাদের উপর উঠে যায়। জানতে চায় দুজনের মধ্যে কে হযরত মুহাম্মদ (সা.), এমন দৃশ্য তো আমরা কখনও দেখিনি।

সিরাতে (সা.) এর বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে ছাদের উপর উঠে মহিলাগণ যে গীত পরিবেশন করে তা ছিল নির্মল আনন্দ উল্লাস আর হৃদয় নিংড়ানো আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরপুর যা আজো নবী প্রেমিকদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে আসছে একইভাবে। "আমাদের উপর উদিত হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ পাহাড়ী পথ বেয়ে । যতক্ষণ আল্লাহর জন্যে ডাকার লোক থাকবে, ততক্ষণই ওয়াজেব থাকবে আমাদের উপর এজন্যে শুকরিয়া আদায় করা। হে আমাদের মাঝে আবির্ভূত ব্যক্তি তুমি এমন মর্যাদা নিয়ে এসেছ যার আনুগত্য আমাদের জন্যে অপরিহার্য। এভাবে হুজুর যখন বনি নাজ্জারের মহল্লায় পৌছেন তখন বালিকাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় "আমরা বনি নাজ্জারের মেয়েরা, কতবড় সৌভাগ্য আমাদের, কত ভাল প্রতিবেশী মুহাম্মাদ (সা.)।

www.bjilibrary.com

এভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) মক্কার চরম প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে এসে মদিনার জমিনে পৌঁছে পেলেন এক অনুপম অনুকূল পরিবেশ। ঝঞ্ঝা-তুফানে ভরা সংগ্রামী অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে পেয়ে গেলেন আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অপূর্ব সুযোগ। যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সর্বযুগের সর্বকালের শান্তি-কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ইহসানের প্রত্যাশী মানবজাতির জন্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ শাসন ব্যবস্থা।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে রাসূলের মক্কা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ থেকে, নীতি-কৌশল থেকে আজকের শিক্ষণীয় দিক নির্দেশনা লাভের আশায় এ বিষয়ে কলম ধরেছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে অতি সংক্ষেপে হলেও এর হক আদায়ের প্রয়াস পেয়েছি। এবার মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তিনি যেন রাসূলের (সা.) মাদানী জিন্দিগীর ওপর নতুন প্রেক্ষাপটে অধ্যয়নের সুযোগ দেন। সুযোগ দেন আজকের প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনা ও পাথেয় সঞ্চয়ের, যা দীন কায়েমে প্রত্যাশী ঈমানদারদের জন্যে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে শক্তি ও প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়।

হিজরাত শেষে মদিনায় পৌঁছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন বিজয় যুগে পদার্পণ করে। তিনি মনোযোগী হন খায়রা উম্মাহ বা উম্মতে ওয়াসাত গঠনের মহান কাজের প্রতি। এর উপর আলোচনার প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহর তাওফীক চেয়ে রাসূলের (সা.) মক্কার জীবনের আলোচনা শেষ করার আগে মদিনা পৌঁছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) তাৎক্ষণিক তিনটি কাজের আলোচনা করতে চাই অতি সংক্ষেপে। এর একটি হল মসজিদে নববী নির্মাণ। দ্বিতীয়টি আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা। তৃতীয়টি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মদিনার নগর রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যে ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিম উম্মাহর চুক্তি স্বাক্ষর যা মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত। হিজরাতে রাসূল (সা.) মূলত মক্কী জিন্দিগীর শেষ আর মাদানী জিন্দিগীর সূচনা। তাই মাদানী জিন্দিগীর সূচনা পর্বের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজের আলোচনা একেবারে না করে শেষ করা মানায় না।

www.bjilibrary.com

মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা

রাসূল (সা.) মদিনা পৌঁছার সাথে সাথেই প্রথম যে চিন্তা করেন তা ছিল একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। যেস্থানে তার উট থেমে ছিল, পূর্ব থেকেই মুসলমানরা এখানে নামাজ পড়ে আসছিল। স্থানটি ছিল দুজন ইয়াতিম সাহল ও সুহাইলের। এদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আসয়াদ বিন যুরায়রা (রা.) মতান্তরে হযরত মুয়াজ বিন আফরাকেও পৃষ্ঠপোষক বলা হয়েছে। কারো মতে তারা দুজনই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এখানে খেজুর শুকানো হত। কিছু খেজুরের গাছও ছিল। ছিল কিছু পুরানো কবর। দুইয়াতীম রাসূলের (সা.) অভিপ্রায় জেনে বিনামূল্যেই মসজিদের জন্যে দান করতে আগ্রহ ব্যক্ত করল বেশ উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু রাসূল (সা.) সম্ভবতঃ তারা ইয়াতিম হবার কারণেই বিনামূল্যে নিতে রাজী হননি।

মসজিদের জন্যে জমি নেয়ার পর তা পরিস্কার করে ফেলা হয়। খেজুর গাছ কেটে তার কান্ড দিয়ে মসজিদের খুঁটি বানানো হয়। খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে বানানো হয় ছাদ বা ছাউনী। পাথর ও কাঁদার গালা দিয়ে তৈরী করা হয় দেওয়াল। খালি জমিন রাখা হয় নামাজের জন্যে। বর্ষায় কাঁদা হওয়ার কারণে পরে মেঝেতে পাথরকুচি বিছিয়ে দেওয়া হয়। আর গরম ঠেকানোর জন্যে খেজুর পাতার ছাউনীতে দেওয়া হয় কাঁদা মাটির প্রলেপ। এই মসজিদ নির্মানে পাথর ও কাঁদা বহনে স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজেও শরীক হন। এই মসজিদের পাশেই নির্মাণ করা হয় হুজুরের এবং তাঁর স্ত্রীদের জন্যে বাসস্থান। দুই কামরা বিশিষ্ট ঘরও ছিল কাঁচা ইটের। খেজুর পাতার বেড়ার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে কামরা পৃথক করা হয়। অতপর হুজুরের পরিবার পরিজনকে মক্কা থেকে মদিনায় আসার ব্যবস্থা করা হয়।

ঈমান ও আদর্শভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

রাসূলের (সা.) একটি ছোট বক্তব্য "তোমরা আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পরের ভাই হয়ে যাও" এর সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন করলেন তিনি মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিয়ে। দীনের খাতিরে মোহাজেরদের সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারের যথার্থ মূল্যায়ন করলেন মদিনার আনসারগণ। তাদের জন্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র অনুভূতি নিয়ে সর্বোচ্চ

www.bjilibrary.com

ও সর্বোত্তম ত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন তারা। মোহাজেরগণ তাদের আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাবকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকৃতি জানান। তবে নিজেদের সম্ভ্রমবোধের কারণে, তারা আর্থিক ও বৈষয়িক দান অনুদানের পরিবর্তে নিজেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে আনসার ভাইদের কাছে সহযোগিতা চাইলেন মদিনার বাজার ঘাট চেনার ব্যাপারে। তারা অকপটে বললেন, আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা জানি। এই ক্ষেত্রে সহযোগিতাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

মদিনা সনদ

মদিনার বাস্তব সমস্যা অনুধাবন করে আল্লহর রাসূল (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে ইয়াহুদীদের সাথে কতিপয় বাস্তবসম্মত বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন, রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপ নেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূলের (সা.) মাদানী জিন্দিগীর আলোচনায় সুযোগ পেলে এ দিকটা বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। এই আলোচনা শেষ করার আগে শুধু ঐ সনদের সার সংক্ষেপ উল্লেখ করতে চাই। এটা উপলব্ধির জন্যে যে ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নে সেখানে বহুজাতির উপস্থিতি ছিল এবং তাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কোন সমস্যা হয়নি। মদিনায় ইয়াহুদীদের অবস্থান ছিল বেশ মজবুত। অইয়াহুদী বলতে আনসারদের দুটি গোত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে এরা ফায়দা লুটতো। নিজেদের স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগিয়েও রাখতো। রাসূল (সা.) এদের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন যার ফলে সম্পাদিত হল এ ঐতিহাসিক চুক্তি। আমরা শুধু এ চুক্তির সংক্ষিপ্ত সার এখানে উদ্ধৃত করছি।

১। রক্ত বিনিময় পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

২। ইয়াহুদী সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

www.bjilibrary.com

৩। ইয়াহুদী ও মুসলমান পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

৪। ইয়াহুদী বা মুসলমান কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সমবেত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবে।

৫। কুরাইশদেরকে কেউ আশ্রয় দেবে না।

৬। মদিনা আক্রান্ত হলে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সবাই মিলে যুদ্ধ করবে।

৭। কোন শত্রুর সাথে এক পক্ষ সন্ধি করলে অপর পক্ষও সন্ধি করবে। কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধের বেলায় এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

---

www.bjilibrary.com

লেখকের অন্যান্য বই

১. ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ
২. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
৩. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কাজ
৪. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি
৫. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
৬. ইসলামী আন্দোলন সমস্যা ও সম্ভাবনা
৭. মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
৮. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
৯. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ